একাল যখন শুরু হল

পুণ্যলতা চক্রবর্তী

পুণ্যলতা চক্রবর্তী

একাল যখন শুরু হল

পুণ্যলতা চক্রবর্তী

একাল যখন শুরু হল

ভূমিকা, অনুষঙ্গ ও সম্পাদনা
জয়িতা বাগচী

সম্পাদনায় সহায়তা
অভিজিৎ সেন
অনিন্দিতা ভাদুড়ী

সূচি

উপক্রম : জয়িতা বাগচী ৭

স্মৃতিচারণ ও পুণ্যলতা চক্রবর্তী : জয়িতা বাগচী ৯

একাল যখন শুরু হল ১৭

একাল যখন শুরু হল ১৯

স্কুল-কলেজ ২৩

ঘরে-বাইরে ২৮

বঙ্গভঙ্গ ৩৩

প্রবাসে ৩৭

অন্দরমহল ৪৩

বাহির দুয়ার ৪৯

ভবিষ্যতের সূচনা ৫৬

পরিশিষ্ট ৬৩

আমার মা পুণ্যলতা চক্রবর্তী : নলিনী দাশ ৬৫

সাহিত্যিকা সংবর্ধনা : মহাশ্বেতা দেবী ৬৭

অনুষঙ্গ ৬৯

গ্রন্থতালিকা ৮৬

বংশলতিকা ৮৮

উপক্রম

অধিকাংশ আলস্যপ্রিয় বাঙালির মতো যখন নিশ্চিন্তে ছুটি উপভোগ করছিলাম তখন আমার সহকর্মী অভিজিৎ সেন প্রায় জোর করেই আমাকে পুণ্যলতা চক্রবর্তীর একটি লেখার সন্ধান করতে পাঠান। *আনন্দবাজার পত্রিকা*-য় ৫ জুলাই, ১৯৬৪ থেকে ৩০ আগস্ট, ১৯৬৪ অবধি আটটি কিস্তিতে রবিবাসরীয় আলোচনীতে 'একাল যখন শুরু হল' বেরিয়েছিল। সেন্টার ফর্ স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস, কলকাতা-র গ্রন্থাগারে বসে পড়ে ফেললাম ধারাবাহিক লেখাটি। চমৎকার লাগলো। এই কথা তাঁর কানে যাওয়ামাত্র আমাকে ব্যস্ত করে তুললেন। যেভাবেই হোক বইটিকে প্রকাশ করতে হবে এবং তার আগে আমাকে খাটতেই হবে। অধিকাংশ পরিশ্রমের কাজগুলো অবশ্য নিজেই করে দিয়েছেন। বলা যেতে পারে আমি সাহায্য করেছি মাত্র। অভিজিৎদা ছাড়া এ বই বেরোনো দুঃসাধ্য ছিল।

অভিজিৎ ভট্টাচার্য যথাসাধ্য সাহায্য করে পুরো লেখাটি আমাকে হাতে ধরিয়ে দেন। আমার বহু আগেই তিনি এটি সম্পাদনার পরিকল্পনা করেছিলেন কিন্তু নানা কারণে তা হয়নি। সে সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে আমি কাজটি করেছি। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। আশা করি অনেকে পড়বেন, ভালো লাগবে, উপকৃত হবেন।

টীকা লেখা বড় বিড়ম্বনার কাজ। অনেক তথ্য দিয়েছি, অনেক হয়তো দিইনি। ব্যক্তিগতভাবে যেগুলো প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে টীকা দিয়েছি। যে তথ্য মনে হয়েছে সহজলভ্য, সেসবের পুনরাবৃত্তি করিনি। কিছু বিষয় নিয়ে টীকা দেওয়ার ইচ্ছা থাকলেও তথ্য দুর্লভ বলে পারিনি। তথ্যের জন্য শিশিরকুমার দাশ সম্পাদিত *সংসদ সাহিত্যসঙ্গী* (সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০০৩), সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও অঞ্জলি বসু সম্পাদিত *সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান*, প্রথম খণ্ড (সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০২), অঞ্জলি বসু সম্পাদিত *সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান*, দ্বিতীয় খণ্ড (সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, মে ২০০৪), সরলা দেবী চৌধুরাণী-র *জীবনের ঝরাপাতা* (সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৮৭৯ শকাব্দ), লীলা মজুমদারের *উপেন্দ্রকিশোর (লীলা মজুমদার রচনাবলী*, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা, মার্চ ১৯৮৩) বিশদভাবে ব্যবহার করেছি। বেলতলা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, গোখলে মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয় তাদের স্ব স্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিষয়ে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখতে সাহায্য করেছে। স্কুল অফ্ উইমেন্স্ স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-এর অধ্যক্ষ শমিতা সেন আমার নিত্য উৎপাত নীরবে এবং হাসিমুখে সহ্য করেছেন। আমার কর্মপ্রতিষ্ঠানের সহকর্মীদের সহযোগিতা এবং উৎসাহ ভুলবার নয়।

হিরণ্ময় কার্লেকার, মধুচ্ছন্দা কার্লেকার, তিলোত্তমা কার্লেকার, অভিজয় কার্লেকার ও অমিতানন্দ দাশ অনুমতি না দিলে এই বইটি ছাপানো সম্ভব হত না। সেন্টার ফর্ স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস, কলকাতা-র গ্রন্থাগারের কর্মীরা নানাভাবে সহায়তা করেছেন। মডলি মিশ্র, প্রীতা ভট্টাচার্য, হার্দিকব্রত বিশ্বাস, অনিন্দিতা ভাদুড়ী, অনিন্দিতা ঘোষ, দেবাশিষ মুখোপাধ্যায় ও দময়ন্তী মিত্র আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ। অনেক নেপথ্য সহযোগীকে ধন্যবাদ জানানো হল না, সেজন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

দে'জ পাবলিশিংয়ের কর্ণধার শ্রীসুধাংশুশেখর দে এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্র শ্রীশুভঙ্কর দে'র আনুকূল্য ছাড়া এ বই প্রকাশিত হত না। তাঁদের প্রতি আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

আমার পরিবারের অত্যাচার ও উদ্দীপনাই আমাকে শৈথিল্য থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করে বলে আমি বিশেষভাবে তাদের কাছে উপকৃত। অমিতাভ, আব্বাস-এর ধন্যবাদ প্রাপ্য কী না কে জানে! তবে প্রচ্ছদশিল্পী অমিতাভকে তাঁর কাজের জন্য ধন্যবাদ।

বইটির যাবতীয় ত্রুটির দায় আমার।

জয়িতা বাগচী
মানবীবিদ্যাচর্চা কেন্দ্র
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সেপ্টেম্বর ২০০৭
কলকাতা ৭০০০৩২

স্মৃতিচারণ ও পুণ্যলতা চক্রবর্তী

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার কথা বলবার এমন একজন সরস প্রত্যক্ষদর্শী বাংলায় বিরল। যতদূর মনে হয় হয়তো বছর দশেক আগে যুগান্তর পত্রিকায় পুণ্যলতা একালের শুরুর কথা নিয়ে ধারাবাহিকভাবে ছয়-সাতটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। দুঃখের বিষয়, সেই সময় ওঁর স্বামীর অসুখের জন্য লেখা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। পরে মনের মতো করে আরেকবার শেষটুকু ঢেলে সাজাবার ইচ্ছা ছিল। সে আর হয়ে ওঠে নি। মনে হয় প্রবন্ধগুলির একটা ঐতিহাসিক মূল্যও আছে, দুঃখের বিষয় পরিচ্ছেদগুলি সংগ্রহ করে উঠতে পারে নি।[১]

উদ্ধৃত অংশের তথ্যে বিশেষ ভুলটি হয়তো অনেকেরই চোখে পড়বে। *একাল যখন শুরু হল* বেরিয়েছিল *আনন্দবাজার পত্রিকা*-র রবিবাসরীয় আলোচনী-তে আটটি কিস্তিতে। তারিখগুলি ছিল ৫ জুলাই ১৯৬৪ (২১ আষাঢ় ১৩৭১ বঙ্গাব্দ) ; ১২ জুলাই ১৯৬৪ (২৮ আষাঢ় ১৩৭১ বঙ্গাব্দ) ; ১৯ জুলাই ১৯৬৪ (৩ শ্রাবণ ১৩৭১ বঙ্গাব্দ) ; ২৬ জুলাই ১৯৬৪ (১০ শ্রাবণ ১৩৭১ বঙ্গাব্দ) ; ২ আগস্ট ১৯৬৪ (১৭ শ্রাবণ ১৩৭১ বঙ্গাব্দ) ; ৯ আগস্ট ১৯৬৪ (২৪ শ্রাবণ ১৩৭১ বঙ্গাব্দ) ; ২৩ আগস্ট ১৯৬৪ (৭ ভাদ্র ১৩৭১ বঙ্গাব্দ) এবং ৩০ আগস্ট ১৯৬৪ (১৪ ভাদ্র ১৩৭১ বঙ্গাব্দ)। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ১৫ আগস্ট ১৯৬৪ খবরের কাগজের অফিস বন্ধ ছিল তাই ১৬ আগস্ট কোনো কাগজ বেরোয়নি।

লীলা মজুমদারের তথ্য সম্পূর্ণ সত্য না হলেও পুণ্যলতার লেখাটি স্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়া নিয়ে তাঁর উদ্বেগ ও আক্ষেপের সঙ্গে অনেকেই হয়তো একমত হবেন। নিঃসন্দেহে এটি অনেকদিন ধরে দুঃখের বিষয় ছিল। পুণ্যলতার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও লেখাটি যে আর কোনোদিনও বর্ধিত করা গেল না সে দুঃখটা অবশ্য রয়েই গেল। কেন যে সেটা খুঁজে পাওয়া যায়নি সেই প্রশ্নের উত্তর আর কেই বা দেবেন! পুণ্যলতা বা লীলা কেউই আর পুস্তকাকারে লেখাটিকে দেখে যেতে পারেননি।

পুণ্যলতা চক্রবর্তীকে নিয়ে ২৮ অগ্রহায়ণ ১৩৮১ বঙ্গাব্দে (৪২ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, পৃ. ৫২১-৫২৩) *দেশ* পত্রিকায় একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন তাঁর খুড়তুতো বোন লীলা মজুমদার। লেখিকা হিসেবে পুণ্যলতার গুরুত্ব স্বীকার করলেও লেখাটি অনেকাংশেই নিকট আত্মীয়ার ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণার মতো। সে ক্ষেত্রে যা মনে পড়ছে, আবছা কিংবা রং-লাগা, তাই লেখা চলে। ইতিহাসের খাতা দেখে তার সত্যতা যাচাই করে নেওয়ার কোনো বাড়তি চাপ থাকে না।

স্মৃতিচারণের এ এক অসুবিধা। ঐতিহাসিক মূল্য থাকলেও তা সবসময় ইতিহাসের প্রামাণ্য তথ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। লেখক বা লেখিকা তো ঐতিহাসিক নন। নির্ভেজাল বাস্তবকে হুবহু বর্ণনা করার জন্য তিনি দায়বদ্ধ নন। অবশ্য এও আমরা জানি যে পৃথিবীতে সব ব্যাখ্যানই আসলে কোনো-না-কোনোভাবে অহংপ্রসূত। অর্থাৎ ঐতিহাসিকও চিন্তা-নিরপেক্ষ নন।

আমাদের মনে রাখা দরকার যে কথাসাহিত্য ইতিহাস নয়, কিন্তু একই সঙ্গে কাহিনী

থেকে ইতিহাসের পঠন সম্ভব। পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত ঐতিহাসিক ঘটনাকে অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করেছে বিখ্যাত লেখকদের সাহিত্য। আবার অনেক বিখ্যাত কাহিনী থেকেই বিশেষ স্থান-কালের ইতিহাস পঠন সম্ভব হয়েছে। সাহিত্যিক, জ্ঞানে-অজ্ঞানে, ইতিহাসবেত্তা না হলে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় তাঁর সৃষ্টি স্বল্পায়ু হয়।

সাহিত্যের সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক নিবিড়। কখনও তারা হাত ধরে হাঁটে, কখনও একে অপরের পরিপূরক, আবার কখনও বা একের অনুষঙ্গ হিসেবে স্মরণ করতে হয় অপরটিকে।

একাল যখন শুরু হল-র পাঠটিতে প্রসঙ্গক্রমে নানান ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ এসেছে বারে বারে। সে সব ঘটনা বা অনুষঙ্গগুলি অনেকক্ষেত্রে একেবারেই অচেনা। কখনো বা সে সব আমাদের স্মৃতিপট থেকে মুছে গেছে। যাঁরা নিয়মিতভাবে ইতিহাসচর্চার সঙ্গে যুক্ত নন তাঁদের পক্ষে অনুষঙ্গ, টীকা ছাড়া হয়তো পঠন কষ্টসাধ্য হবে। আমার বিশ্বাস পরিশিষ্টের অনুষঙ্গ পেয়ে তাঁরা উপকৃত হবেন।

> পুণ্যলতা চক্রবর্তী এই ধারাবাহিক স্মৃতিচারণে উনিশ শতক ও বিশ শতকের সন্ধিক্ষণ থেকে আজ অবধি বাংলাদেশের নারী সমাজে যে পরিবর্তন স্বচক্ষে দেখে এসেছেন তারই বহুবর্ণ চিত্র ক্রমশ উপস্থিত করবেন।[২]

এখানে মনে রাখা দরকার যে পাঠটির ৫ম কিস্তি, যা এখন ৫ম পরিচ্ছেদ, ছিল, 'প্রবাসে'। সদ্য তৈরি হয়ে ওঠা বিহার প্রদেশের রাজধানীতে অনেকদিন কর্মরত ছিলেন পুণ্যলতার স্বামী অরুণনাথ। সেখানে বাঙালীদের কেমন দেখেছেন পুণ্যলতা, কী করেই বা তাঁদের মধ্যে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগানোর চেষ্টা করেছিলেন তিনি, এ সব বলেছেন সে পরিচ্ছেদে। এ ক্ষেত্রে পাত্রীরা বাংলাদেশের হলেও স্থানটি কিন্তু বাংলা নয়।

আনন্দবাজার পত্রিকা-তে *একাল যখন শুরু হল*-র উপক্রমণিকা-তেও ব্যবহৃত হয়েছে 'স্মৃতিচারণ' শব্দটি। শান্তা সেন একটি নিবন্ধে লিখেছেন :

> ১৯৬৪ সালের ৫ জুলাই থেকে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত সংখ্যায় এই স্মৃতিচারণমূলক রচনা 'একাল যখন শুরু হল' প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর (পুণ্যলতার) নিজের জীবনে উনিশ শতক থেকে বিশ শতকের সন্ধিকালের যে অভিজ্ঞতা তারই বর্ণনা করেছেন এতে—বিশেষ করে তখনকার মেয়েদের জগতের পরিবর্তনের ছবি।[৩]

আমরা ধরেই নিতে পারি যে ঐতিহাসিক বিবর্তন বিষয়বস্তু হলেও এ এক ব্যক্তিকেন্দ্রিক আখ্যান। শুধুমাত্র স্বচক্ষে যা দেখা সে তো বিশেষ চোখের পরিপ্রেক্ষিতেই দেখা। সে দৃষ্টি যতদূর যাবে সেই পর্যন্তই তো বিষয়ীভূত হবে। স্থানান্তরিত হলেও সে প্রেক্ষিত হয়ত আংশিক হবে। নিরপেক্ষ হবার সুদূর প্রচেষ্টাটুকুও এখানে অনুপস্থিত। পুণ্যলতা কীভাবে ঐতিহাসিক পালাবদলে অংশগ্রহণ করেছিলেন, ইতিহাসকেই বা তিনি কী অর্থে পরিবর্তনশীল মনে করছেন, তার মধ্যে দিয়ে তিনি ইতিহাসে তাঁর অবস্থানকেই বোঝার চেষ্টা করেছেন। কোনো সম্পূর্ণতার রূপ দিতে তিনি চেষ্টা করেননি। জীবনমাত্রেই

ঘটনাবহুল কিন্তু ব্যক্তিগত ঘটনাকে চারপাশের বৃহত্তর রাজনীতির অংশ এবং একইসঙ্গে সামাজিক-রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সহায়ক পাঠ হিসেবে পড়তে পারার জন্য এক ধরনের বিশেষ প্রবণতার প্রয়োজন আছে।

একাল যখন শুরু হল এই প্রথম পুস্তকাকারে বেরোচ্ছে। প্রাক-পরিচয় দেবার জন্য লেখিকা আর নেই। তিনি ঠিক কী মন নিয়ে এই লেখাগুলি শুরু করেছিলেন জানা যাবে না।

২

> ...সু-সম্বদ্ধ ভাবে পারিবারিক বা সামাজিক জীবনের বিবরণ দেবার চেষ্টা করিনি ; স্মৃতির পটে ছবির মতো যা ফুটে উঠেছিল, গল্পচ্ছলে তাই বলেছি। আমার আদরের নাতিরা এই সব গল্প শুনতে ভালোবাসে, ...অন্য ছেলে-মেয়েদেরও হয়তো তা ভাল লাগবে, এই বিশ্বাসে প্রকাশ করা হল।[৪]

১৯৫৮ (বঙ্গাব্দ ১৩৬৫)-তে যখন তাঁর বই *ছেলেবেলার দিনগুলি*-র সূচনা লিখেছেন তখনই পুণ্যলতা কবুল করে নিয়েছেন যে কোনো ইতিহাসবেত্তার ভূমিকায় তিনি অবতরণ করেননি। এই স্মৃতিচারণ একেবারেই এক গাল্পিক ঢঙে লেখা। অতএব সত্যমিথ্যা মনের মাধুরী দিয়ে মিশিয়ে নিলে কোনো আদালতই তাঁকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে না। বইটি তাঁর জীবদ্দশায় বেরিয়েছিল। অতএব প্রাক-কথন লেখা বা না-লেখা ছিল তাঁর উপর। তিনি মনের আনন্দে এগুলি সাজিয়ে রেখেছিলেন নিজের খাতায়। ছেপে বেরোবে এমন হয়তো ভাবেননি। তাঁর ছোটোবেলার গল্প শুনতে ভালোবাসতেন আদরের নাতিরা, তাই এগুলো প্রাণ দিয়ে বলতেন তাদের। বইটি উৎসর্গও করেছেন চার নাতিকে। কল্যাণীর তিন পুত্র রনু (হিরণ্ময় কার্লেকার), তোতো (রণজয় কার্লেকার), জোজো (অভিজয় কার্লেকার) এবং নলিনীর পুত্র বাবু (অমিতানন্দ দাশ)-কে। ভ্রাতুষ্পুত্র সত্যজিৎ রায়ের অনুরোধে এটি ছাপানো হয়। এর আগে বেশ কিছু গল্প, প্রবন্ধ, ইত্যাদি লিখলেও এই তাঁর জীবনে প্রথম এবং একমাত্র বই। *ছেলেবেলার দিনগুলি* ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল *দেশ* পত্রিকায়, পরে গ্রন্থাকারে বেরোয় নিউ স্ক্রিপ্ট থেকে, যেটা আবার ছিল পরিবারেরই প্রকাশনা সংস্থা।

> এগুলি খাতায় লিখে রেখেছিলাম—বই করবার উদ্দেশ্য ছিল না।[৫]

সন্দেশ পত্রিকায় এর আগে অনেক লেখা তিনি লিখেছেন। লেখিকা হিসেবে সম্পূর্ণ অপরিচিত এমনটা নন মোটেও। শিশু-সাহিত্যের জগতে বরং তিনি বেশ জনপ্রিয়। মে ১৯৬১ (১৩৬৮ বঙ্গাব্দ)-তে সত্যজিৎ রায় ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় *সন্দেশ* পত্রিকার নবপর্যায়-এর প্রথম সংখ্যা বেরোয়। এই সংখ্যার ভূমিকাটি লেখেন পুণ্যলতা। এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে *সন্দেশ*-এর প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী তাঁর পিতা বা পরবর্তী সম্পাদক সুকুমার রায় ও সুবিনয় রায় তাঁর দুই ভাই হওয়াটাই তাঁর লেখার একমাত্র কারণ ছিল না।

এর অনেক পরে *সন্দেশ*-এ প্রকাশিত বেশ কিছু ছোটোদের গল্প নিয়ে বেরোয় *ছোট্ট ছোট্ট গল্প*। *ছেলেবেলার দিনগুলি*-র থেকে এ বইটি ছিল একেবারেই ভিন্ন স্বাদের। এ পর্যন্ত এই তাঁর সম্পূর্ণ পুস্তক তালিকা। *সন্দেশ* পত্রিকায় প্রকাশিত খুদে সদ্য-পড়ুয়াদের জন্য লেখা অনেকগুলি ছোট্ট ছোট্ট গল্প-কে একত্রিত করে তাঁর মৃত্যুর প্রায় এক মাস পরে প্রকাশিত হয় তাঁর বই *ছোট্ট ছোট্ট গল্প*। আকারে সেগুলি একপাতা বা তার চেয়েও কখনো ছোটো।

> 'খোকাখুকু আর তাদের খেলার সাথী কুকুর, বেড়াল, হাঁস, মুরগী, টিয়া এমনকি হরিণ, কাঠবিড়ালী, ব্যাঙ ও ইঁদুরছানার সুখদুঃখের মধুর, করুণ ও মজার এই ছোট্ট ছোট্ট গল্পগুলি' বড় টাইপে, বড় ছবিসহ বেশির ভাগই এক পৃষ্ঠাতে সম্পূর্ণ। অনেক গল্পই শেষ তের-চোদ্দ লাইনে, সব চেয়ে ছোট গল্পটি মাত্র বারো লাইনে লেখা। অথচ এত ছোট গল্পের মধ্যেই আছে সুন্দর প্লট ও নাটকীয় রস।[৬]

বইটি বেরোয় আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড থেকে।

৩

শৈশবের আত্মজীবনী *ছেলেবেলার দিনগুলি*

১৮৮৯ সালে (২রা ভাদ্র ১২৯৬ বঙ্গাব্দ) খুসি ওরফে পুণ্যলতা রায়চৌধুরী জন্মেছিলেন বিখ্যাত এক পরিবারে। বহুমুখী প্রতিভাধর পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ছিলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রধান কর্মকর্তাদের একজন। অবশ্য সেটুকুই তাঁর পরিচয় নয়। সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞ এই মানুষটি ছিলেন শিশুদের পত্রিকা *সন্দেশ*-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। উপেন্দ্রকিশোরের স্ত্রী বিধুমুখী ছিলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা। তাঁর আর চার ভাইবোনের (হাসি, তাতা, মণি ও টুনি) মতো খুসিও জন্মেছিলেন ১৩নং কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে (এখন যা বিধান সরণী)। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দিরের ঠিক উল্টোদিকে এই ১৩ নং বাড়িটি ছিল ১৯ শতকে বাংলাদেশের প্রগতিশীল সমাজসংস্কারকদের পীঠস্থান। এই বাড়ির ভাড়াটেরাও ছিলেন নামজাদা বুদ্ধিজীবী ও সমাজসংস্কারক।

> নিজ সমাজে নির্যাতিত হয়ে বহু ব্রাহ্ম চলে এসে এই বাড়িতে থাকতেন। রামকুমার বিদ্যারত্ন (পরবর্তীকালে সন্ন্যাসী রামানন্দ ভারতী) সপরিবারে থাকতেন উপেন্দ্রকিশোরের পাশেই দু'একটি ঘর নিয়ে। এই বাড়ির তিনতলায় থাকতেন দ্বারকানাথ ও তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কাদম্বিনী গাঙ্গুলী। 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার দপ্তরও কিছুকাল এ বাড়িতে ছিল। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণও থাকতেন এ বাড়িতে। শিবনাথ শাস্ত্রীও কিছুকাল ছিলেন এ বাড়িতে। কখনো কখনো মাঘোৎসবের সময় বালক-বালিকা সম্মেলনের খাওয়া-দাওয়া হত এই বাড়ির বিরাট ছাদে। এই ঐতিহাসিক বাড়িটিতে এককালে নবগোপাল মিত্রের 'ন্যাশনাল স্কুল'-এর ক্লাশ হত।

রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বিষয়ক বক্তৃতাও হয়েছে এ বাড়িতে। এমন কি একালের গবেষণায় প্রমাণ হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়-জীবনের শুরু এ বাড়ির 'ক্যালকাটা ট্রেনিং অ্যাকাডেমি'তে। বহু বিখ্যাত ব্যক্তি নানা কারণে এখানে আসতেন।[৭]

কিংবদন্তী বাড়িটি পরিচিত ছিল 'লাহাবাবুদের বাড়ি' নামে। অঞ্চলটিকে সবাই বলতেন 'সমাজপাড়া'।

পুণ্যলতার প্রথম স্কুল ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় এ বাড়ির মধ্যেই ছিল। এই স্কুলের উল্লেখযোগ্য মাস্টারমশাইদের মধ্যে ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর স্বয়ং। পরবর্তীকালে অবশ্য পুণ্যলতা পড়েছিলেন বেথুন স্কুলে। সেখান থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করে ১৯০৪ সালে ভর্তি হন বেথুন কলেজে এফ এ ক্লাসে। এফ এ পাস করে বি এ-তে ভর্তি হলেও তিনি শেষ পরীক্ষা দেননি। সম্ভবত ১৯০৭-এর পরে তিনি আর কলেজে যাননি। ধরে নেওয়া যায় যে সাংসারিক দায়িত্ব বেড়ে যাওয়ার কারণেই তিনি আর স্নাতকপর্ব শেষ করতে পারেননি।

ছেলেবেলায় দুর্দান্ত দস্যিপনা করার অফুরন্ত সুযোগ পেয়ে সেটা কাজে লাগিয়েছিলেন পুণ্যলতা। অনেক ছেলেমেয়ের মধ্যে মানুষ হয়ে জীবনটাকে খুব আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করতে শিখেছিলেন। পারিবারিক পরিবেশটাই এমন ছিল যে তার প্রভাবে এ বাড়ির প্রায় প্রত্যেক ছেলেমেয়েই কোনো-না-কোনোভাবে হয়ে উঠেছিলেন সৃষ্টিশীল। তার সঙ্গে *সন্দেশ* সেই সৃজনশীলতাকে উস্কে দিয়েছিল, কারণ পত্রিকার পাতা ভরানোর দায়িত্ব অনেকখানি ছিল পরিবারের লোকজনের ওপর। পুণ্যলতার দিদি সুখলতা রাও বা দাদা সুকুমার রায় শিশু-সাহিত্যের জগতে সুপরিচিত নাম। কম পরিচিত হলেও পুণ্যলতার কনিষ্ঠ দুই ভাই সুবিনয় এবং সুবিমলও বহুপ্রসূ ছিলেন। ছোট বোন শান্তিলতাও ছিলেন *সন্দেশ*-এর লেখিকা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়া, যে সময়টা জুড়ে পুণ্যলতার শৈশব, সেই সময়ের কথা এবং এই বিখ্যাত বাড়ির স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বদের কথা জানার জন্য *ছেলেবেলার দিনগুলি* একটি আকর গ্রন্থ। রসবন্ত এবং তথ্যপূর্ণ বইটি এখন সুবিদিত।

১লা বৈশাখ ১৩২০ বঙ্গাব্দ (১৯১৩) ছিল 'একটা বিশেষ দিন'।[৮] *সন্দেশ*-এর প্রকাশ তারিখ। এই সময়ে পুণ্যলতার বয়স তেইশ বছর। পরিবারের অনেকের মতো লেখিকা পুণ্যলতার আত্মপ্রকাশ ঘটে এই পত্রিকাতে এবং এখানেই তিনি উজাড় করে দেন তাঁর সাহিত্যিক সম্পদ। এর আগে তিনি কোথাও লিখেছিলেন কিনা জানা যায় না। শান্তা সেন অবশ্য বলেছেন যে :

সুকুমার রায়ের অকাল মৃত্যুর পরে 'সন্দেশ'-এর ভার যখন মেজো ভাই সুবিনয় নিলেন, তখন ভালো লেখার অভাব মেটাতে বাড়ির সবাইকে তিনি লিখতে বলেন এ পত্রিকায়। পুণ্যলতা তখনই প্রথম লিখতে শুরু করেন।[৯]

অর্থাৎ উপেন্দ্রকিশোর বা সুকুমার যে সময় সম্পাদক ছিলেন সে পর্যায়ে তিনি কিছুই লেখেননি। এ তথ্য-র সত্যতা যাচাই করা মুশকিল। *সন্দেশ*-এর গোড়ার আমলে অনেক লেখাই ছিল অস্বাক্ষরিত, বিশেষ করে যদি সেসব লিখতেন বাড়ির পরিজনরা।

এর মধ্যে ১৯০৮ সালে বিহার সার্ভিসের ক্যাডার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অরুণনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে বিয়ে হয় পুণ্যলতার। এর পর থেকেই তিনি পুণ্যলতা চক্রবর্তী।

> ...তাঁর শিল্পরুচি ও নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে হাতের কাজে কাপড়ের উপরে নানা ধরনের নকশা রচনায়। সে সব নকশা সম্পূর্ণই তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবন—কাঁথা, ব্লাউজ, ফ্রক—এ জাতীয় সব কিছুতেই মন থেকে তৈরি ডিজাইন বহু মেয়েকে নানা সময়ে দিয়েছেন। 'বিদ্যাসাগর বাণীভবন'-এর মেয়েরা স্কার্ফ বুনতেন, তিনি সেই স্কার্ফের পাড়ের জন্য ডিজাইন তৈরি করে দিতেন অনেক সময়ই।[১০]

দুই কন্যা নলিনী ও কল্যাণী-কে নিয়ে পুণ্যলতা জীবনের অনেকটা সময়ই কাটিয়েছিলেন স্বামীর সঙ্গে প্রবাসে। সন্তানদের শিক্ষাদানের জন্য নানা ধরনের নিজস্ব পদ্ধতি উদ্ভাবন ও অবলম্বন করেছেন। সেসব অবশ্য খানিকটা তিনি শিখেছিলেন উপেন্দ্রকিশোরের কাছ থেকে। নলিনী (পরবর্তীকালে দাশ) যুক্ত ছিলেন *সন্দেশ* পত্রিকার সঙ্গে দীর্ঘকাল। সম্পাদক ছিলেন অনেকদিন। কল্যাণী (পরবর্তীকালে কার্লেকার) ছিলেন সমাজসেবী। কলকাতার বিশিষ্ট একটি সমাজসেবী সংস্থার তিনি প্রতিষ্ঠাত্রী। কৃতি পরিবারের পারম্পর্য বজায় রেখেছিলেন তাঁরাও।

দীর্ঘায়ু পুণ্যলতা শেষ বয়স পর্যন্ত কর্মঠ ছিলেন। যেমন ছিল তাঁর স্মৃতিশক্তি, তেমনি ছিল তাঁর চারুশিল্পের ওপর দক্ষতা। তাঁর শেষ বয়সের গল্পের মুগ্ধ শ্রোতারা ছিলেন তাঁর আদরের নাতি-পুতিরা।

১৯৭৪ সালের ২১ নভেম্বর তিনি মারা যান।

৪

> [মা] অনেক গল্প লিখেছিলেন সন্দেশে, 'দাদুর গল্প' নাম দিয়ে বাবার কর্মজীবনের মজার অভিজ্ঞতার অনেক কথা সরস ভাষায় লিখেছিলেন।[১১]

উপরের এই তথ্যটি আমাদের চমকে দিতে বাধ্য। কারণ লেখাগুলি বেরিয়েছিল পুণ্যলতার স্বামী অরুণনাথ চক্রবর্তীর নামে।[১২] সন্দেহ থেকেই যায়, হয়তো অন্য কোনো স্থানেও আনাচে-কানাচে নামে-বেনামে ছড়িয়ে আছে তাঁর আরো লেখা। আবার এও হতে পারে যে পুণ্যলতার কথা লিখতে গিয়ে ভুলবশত নলিনী দাশ এই লেখাটি উল্লেখ করেছেন। স্মৃতি তো অপরিবর্তনশীল কোনো আকার নয়, ঘসে-মেজে হয়তো তার অবস্থান্তর ঘটে গেছে।

গল্পগুলি সবই শিকারের বা শিকারীর সঙ্গে থাকার অভিজ্ঞতার। রোমাঞ্চকর এইসব গল্প এখন স্পর্শকাতর বিষয়। পরিবেশ সম্পর্কে বেশিরভাগ বাচ্চাদেরই দেওয়া হয় অন্য

মনের সূক্ষ্ম-সংবেদী পাঠ। রুচি বা বলা যেতে পারে প্রয়োজনের পরিবর্তন হলেও এইসব গল্পগুলিতে আছে এমন মজা যা এখনকার শিশুদেরও উপভোগ্য বলে মনে হতে বাধ্য।

পুণ্যলতার লেখার মোট পরিমাণ স্বল্প। অনেক লেখা *সন্দেশ* পত্রিকার পাতায় পাতায় আজও অপেক্ষা করছে গ্রন্থনার জন্য। *সন্দেশ* ছিল পারিবারিক পত্রিকা। রায়চৌধুরীদের বাড়ির অনেক ব্যক্তিই লিখেছিলেন তাতে। বিশেষ করে উপেন্দ্রকিশোরের ছেলেমেয়েরা তো বটেই।

> ...তিনি (পুণ্যলতা) 'সন্দেশ'-এ অনেক গল্প লিখেছেন। উদ্ভিদতত্ত্ব তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল। ১৯৩২ কি ৩৩ সালে সন্দেশ-এ এই বিষয় নিয়ে সরসভাবে লিখেছেন 'গাছপালার কথা'। 'সন্দেশ'-এ একটি কিশোর-উপন্যাসও লিখেছেন 'রাজবাড়ি' নামে। এ সকল রচনাই 'সন্দেশ'-এর পাতাতে ছড়িয়ে আছে, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি।[১৩]

যতদূর জানা যায় পুণ্যলতা এই পত্রিকা ছাড়া বিশেষ কোথাও খুব একটা লেখেননি।

> সম্ভবত তাঁর শেষ রচনা 'বেথুন কলেজ পত্রিকা'য় ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের বার্ষিক সংখ্যায় প্রকাশিত 'বেথুন দিবস'-এর স্মৃতিচারণটি।[১৪]

পুণ্যলতা লেখাকে কোনোদিন পেশা হিসেবে গুরুত্ব দিয়ে ভাবেননি। বহুপ্রজ লেখিকা সুখলতার সঙ্গে তাঁর ছোটো বোন পুণ্যলতার এখানেই অনেকটা পার্থক্য। জীবনটাকে সরসভাবে উপভোগ করায় ছিল তাঁর আনন্দ। যা লিখেছেন তার সিংহভাগ হল সত্যিকারের কোনো ঘটনাকে রংদার করে উপস্থিত করা। বোঝাই যায় মানুষটির মনটাই ছিল গল্পকারের। যা শোনেন, যা দেখেন, তাকেই করে ফেলতে পারেন গল্পের উপাদান। আলাদা করে কল্পলোক সৃষ্টি করার জন্য তাঁকে প্রাণপাত করতে হয় না। জানা-শোনা সাধারণ/অসাধারণ ঘটনাই হয়ে উঠেছে গল্প।

এ কথা *ছেলেবেলার দিনগুলি* বা *একাল যখন শুরু হল*-র প্রসঙ্গে সত্যি। যদি ধরে নেওয়া যায় যে 'দাদুর গল্প'-ও পুণ্যলতারই লেখা, তাহলে সে ক্ষেত্রেও আশপাশের ঘটনাবলীই গল্পের উপকরণ। এমন-কী *ছোট্ট ছোট্ট গল্প*-র জন্যও হয়ত চারপাশের ঘটে যাওয়া কাহিনীগুলোকেই কুড়িয়ে নিয়ে সাজিয়েছিলেন তিনি।

জয়িতা বাগচী
মানবীবিদ্যাচর্চা কেন্দ্র
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।
৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৭
কলকাতা ৭০০০৩২।

সূত্রনির্দেশ

১. লীলা মজুমদার : 'পুণ্যলতা', *লীলা মজুমদার রচনাবলী : ২*, কলকাতা, এশিয়া পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৮, পৃ. ৩৪১-৩৪২।

২. 'রবিবাসরীয় আলোচনী', *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ৫ জুলাই ১৯৬৪ (২১ আষাঢ় ১৩৭১ বঙ্গাব্দ), কলকাতা।

৩. শান্তা সেন : 'সুখলতা-পুণ্যলতা', *বেথুন কলেজ শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ* ১৮৭৯-১৯৭৯, বেথুন কলেজ, কলকাতা, মার্চ ১৯৮০, পৃ. ৪৬।

৪. পুণ্যলতা চক্রবর্তী : *ছেলেবেলার দিনগুলি,* নিবেদন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জানুয়ারি, ১৯৯৭, পৃ. ৫।

৫. ঐ।

৬. শান্তা সেন, ঐ, পৃ. ৪৬-৪৭। উদ্ধৃত অংশটি বুদ্ধদেব বসু-র 'বাংলা শিশুসাহিত্য', *সাহিত্যচর্চা* থেকে নেওয়া।

৭. হেমন্তকুমার আঢ্য : 'উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী : জীবনী', *কোরক সাহিত্য পত্রিকা,* উপেন্দ্রকিশোর সংখ্যা, বইমেলা ২০০৫, কলকাতা, পৃ. ১৭৫।

৮. '১লা বৈশাখ ১৩২০।...হাতে তাঁর [উপেন্দ্রকিশোর] সন্দেশের প্রথম সংখ্যা। কি চমৎকার মলাট।...আমাদের বুঝতে বাকি রইল না যে আজ একটা বিশেষ দিন।' লীলা মজুমদার : *পাকদণ্ডী,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, বইমেলা ১৯৮৬, পৃ. ২১-২২।

৯. শান্তা সেন, ঐ, পৃ. ৪৫।

১০. শান্তা সেন, ঐ, পৃ. ৪৭।

১১. নলিনী দাশ : 'আমার মা পুণ্যলতা চক্রবর্তী', *আজকাল,* ১০.৯.১৯৮৯, কলকাতা।

১২. দ্র. সত্যজিৎ রায় সম্পাদিত : *সেরা সন্দেশ* ১৩৬৮-১৩৮৭, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ।

১৩. শান্তা সেন, ঐ, পৃ. ৪৫।

১৪. শান্তা সেন, ঐ, পৃ. ৪৭।

পুণ্যলতা চক্রবর্তী

একাল যখন শুরু হল

একাল যখন শুরু হল

কথায় বলে ; 'কালে কালে আর কতই দেখবো।'

পায়ে পৌনে শতাব্দীর পথ তো পার হয়ে এলাম, এখন আমার 'তিনকাল গিয়ে এককাল' চলছে। জীবনে আমার বিশেষত্ব বা অসাধারণত্ব কিছুই নাই, তবে দীর্ঘ কালের বিচিত্র অভিজ্ঞতা আছে—কালে কালে কত কিছু দেখেছি। আমাদের নারী-সমাজের বিবর্তনের এই কালের মধ্যে কত যে পরিবর্তন ও ক্রম-বিবর্তন দেখলাম, ভাবলে অবাক হয়ে যাই—চলচ্চিত্রের মত কত ছবির পর ছবি যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

উনিশ শতকের শেষভাগ—দেশে স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যে তুমুল আন্দোলন উঠেছিল সে উত্তাপ ততদিনে শান্ত হয়ে এসেছে ; মেয়েদের ঘরের বাইরে আসা, স্কুল, কলেজে যাওয়া, বি এ এম এ পাস করাও লোকের কাছে অনেকটা গা সহা হয়ে গিয়েছে। প্রাচীন ও নবীন সমাজ—দুই দিকেরই 'গোঁড়া' বা উগ্র দলের মধ্যে বিরোধ থাকলেও, মাঝখানে উদার, উন্নতিশীল, আদর্শপরায়ণ, এমন একটি শিক্ষিত সমাজ ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে, নূতনের আলো যাঁদের চোখ খুলে দিয়েছে কিন্তু ধাঁধিয়ে দিতে পারেনি—পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাকে নির্বিচারে অনুকরণ না করে, তার মধ্যে যা কিছু ভাল ও কল্যাণকর মনে হয়েছে তাই তাঁরা সাদরে গ্রহণ করেছেন এবং দেশের প্রাচীন আদর্শের মধ্যে যা শুভ ও সুন্দর বলে বুঝেছেন তাও সযত্নে রক্ষা করেছেন। সংখ্যায় অল্প হলেও একটু একটু করে প্রাচীন সমাজের মধ্যেও তাঁরা অলক্ষ্যে প্রভাব বিস্তার করছিলেন।

এমনি একটি সুষ্ঠু পরিবেশের মধ্যে এক বিশিষ্ট পরিবারে জন্মলাভ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। নূতন ও পুরাতনের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার সুন্দর দৃষ্টান্ত শৈশব থেকেই আমাদের চোখের সামনে ছিল। আমাদের পিতা, স্বনাম-ধন্য উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ব্রাহ্ম হয়েছিলেন এবং নিজে কায়স্থ সন্তান হয়েও ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ করেছিলেন।[১] এতে তাঁর আত্মীয়স্বজন প্রথমে নিশ্চয়ই খুব অসন্তুষ্ট হয়ে থাকবেন। কিন্তু অল্পদিনেই সে অসন্তোষের চিহ্ন মিলিয়ে গিয়েছিল। বাবার সহোদর ছয়টি ভাইবোনের মধ্যে তিনজন ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়েছিলেন, তিনজন হিন্দুসমাজেই ছিলেন—আমরা জন্মাবধি তাঁদের সকলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ, মধুর সম্পর্ক দেখে এসেছি।[২] তাঁরা ভিন্ন বাড়িতে থাকতেন, আচার অনুষ্ঠানে দু'পক্ষই নিজেদের মত ও বিশ্বাস অনুসারে চলতেন কিন্তু মতে অমিল সত্ত্বেও মনের মিল তাঁদের সুদৃঢ় ছিল। বাবামায়ের মধুর চরিত্রের আকর্ষণে আমাদের বাড়িটি হয়েছিল যেন আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলের সুখের মিলনক্ষেত্র।

সেই বাড়িরই অন্য অংশে থাকতেন আমাদের মাতামহ—নারী-কল্যাণব্রতী, সমাজসেবক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।[৩] মা তাঁর প্রথম পক্ষের কন্যা। মায়ের বিমাতা, দাদামশাইয়ের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন নারীপ্রগতির পথে একজন অগ্রবর্তিনী—ভারতের প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট এবং দ্বিতীয় পাসকরা বিলাতের উপাধিধারিণী মহিলা ডাক্তার।[৪] দিদিমাকে দেখতাম—মাতৃভাষার মতই সুন্দর অনর্গল ইংরিজি বলতে পারেন, তখনকার সবচেয়ে আধুনিক ফ্যাশনের শাড়ি জামা জুতো পরে সহজ স্বচ্ছন্দভাবে

চলাফেরা ও বাহিরের কাজকর্ম করেন, আবার গৃহকর্মেও তিনি সুনিপুণা।

রূপেগুণে উজ্জ্বলা সেই আধুনিকা দিদিমার পাশে দেখতাম জপ-মালা হাতে নামাবলী গায়ে, আমাদের (মায়ের পিসীমা) বড়দিদিমাকে[৫]—নিত্য শিবপূজা করেন, স্বপাকে নিরামিষ আহার এবং গঙ্গাজল পান করেন। দিদিমা তাঁর এই বয়োবৃদ্ধা ননদকে খুব শ্রদ্ধা ও মান্য করে চলতেন—এঁর হাতেই সংসারের অনেক কাজ তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বাইরের কাজে যেতে পারতেন। যখন বাবার সঙ্গে আমাদের দেশে যেতাম, পূর্ববঙ্গের সেই সুদূর পল্লীগ্রামের বাড়িতে দেখতাম—শ্যামল পল্লীশ্রীর মতই শান্ত, স্নিগ্ধ আমাদের স্নেহময়ী ঠাকুরমাকে।[৬] সর্বদা কাছে পেতেন না বলেই বোধহয়, ঠাকুরমার অতৃপ্ত স্নেহ যেন শতধারায় ঝরে পড়তো আমাদের উপরে। সে স্নেহের স্বাদ কোনদিন ভুলবো না—যেমন, আজ পর্যন্ত ভুলিনি ঠাকুরমাদের হাতের নিরামিষ রান্না ও নানারকম মিষ্টান্নের সেই অপরূপ স্বাদ!

ঠাকুরমা আর বড়দিদিমা—একজন নিষ্ঠাচারিণী বিধবা, অন্যজন কুলীন ব্রাহ্মণ ঘরের চিরকুমারী, বিধবার মতই শুদ্ধাচারিণী—দুজনেই বাংলা লেখাপড়া বেশ ভাল জানতেন। বড়দিদিমা যখন তরুণী ছিলেন, সে সময় বাংলাদেশে কুলীন সমাজের চরম দুর্গতি হয়েছিল। অনেক কুলীন-সন্তানের বিবাহ করাটাই পেশা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, এবং 'আচার, বিনয়, বিদ্যা' ইত্যাদি গুণের বদলে তাদের 'কুল-লক্ষণ' যে কি রকম হয়েছিল, দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাই-বারিক' নাটকে তার সুস্পষ্ট চিত্র রয়েছে।[৭] বড় বড় কুলীনঘরের কন্যাদের জন্য সমান ঘরের পাত্র পাওয়া অতি কঠিন হয়েছিল—হয়তো অতিবৃদ্ধ কোন কুলীন-প্রবর দয়াপরবশ হয়ে তাঁর একশোটি বিবাহের উপর আরেকটি বিবাহ করে কোন কুলীন কুমারীকে উদ্ধার করতেন ; এমনও হত যে, অতিকষ্টে যদি একটি পাত্র মিলতো, তা হলে সেই পরিবারে বালিকা-কিশোরী-যুবতী সব কটিকে একসঙ্গে এক বরের হাতেই সম্প্রদান করা হত। এই সব কাণ্ড দেখে শুনে বড়দিদিমার আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছিল—এমন অপমানকর বিবাহ করার চেয়ে চিরকুমারী থাকাই স্থির করে এই তেজস্বিনী কুলীনকন্যা তাঁর ব্রাহ্ম ভাইয়ের কাছে চলে এসেছিলেন। দাদামশাই তাঁর দিদিকে খুব আদর ও সম্মানের সঙ্গে কাছে রেখেছিলেন—তাঁর পূজা ও আচার পালনের সুব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

ঠাকুরমা গ্রামের বাড়িতেই থাকতেন, মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন। তাঁর মন যেমন উদার ছিল, তেমনি ছিল তাঁর বিচার-বিবেচনা। মার কাছে শুনেছি, মা যখন প্রথম দেশে যান, তখন সেখানে মেয়েদের জুতো পায়ে দেয়া তো দূরের কথা জামা গায়ে দেওয়ারও রীতি ছিল না ; তবু ঠাকুরমা মাকে বলেছিলেন, 'তোমার তো অভ্যাস নাই, অসুখ করবে—তুমি জুতো পায়ে দিয়ো, তাতে দোষ হবে না।' খালি পায়ে থাকা মায়ের যথেষ্ট অভ্যাস আছে বুঝিয়ে বলাতে তখন তিনি আশ্বস্ত হলেন। মা ব্রাহ্মণকন্যা বলে দেশের গুরুজনদের মধ্যে অনেকে তাঁকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে দিতেন না। ঠাকুরমা কিন্তু জেনে বলেছিলেন, 'বামুনের বেটিই হোক, আর যে জাতের বেটিই হোক, আমার ব্যাটার বৌ যখন হয়েছে, আমি কেন পায়ের ধুলো দেব না?'

পল্লীজীবনের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয়, একমাত্র দেশের গ্রামের মধ্যে দিয়েই

না কিছু ছিল। শহরের চেয়ে পল্লীসমাজ অনেক বেশী রক্ষণশীল হয়, তবু একটু একটু করে শহরের হাওয়া কেমন করে গ্রামে ঢোকে, তার একটা মজার গল্প মার কাছে শুনেছিলাম। মা যখন প্রথম গ্রামে গিয়েছিলেন, তাঁর দেখাদেখি আমাদের নিকট আত্মীয়া ৮।৯ বছরের একটি ছোট মেয়ের সেমিজ গায়ে দেবার ভারী শখ হল। মা তাকে সুন্দর একটি গোলাপী রঙের সেমিজ সেলাই করে দিলেন ; সেটি গায়ে দিয়ে আহ্লাদে অধীর হয়ে মেয়েটি সবাইকে দেখিয়ে বেড়াচ্ছে—যেই না তার দাদার সামনে পড়া, অমনি ঠাস করে এক চড় মেরে দাদাটি বললেন, 'আবার স্যামিজ গায়ে দেওয়া হইছে। ব্রাইম্‌ভ হওনের সাধ হইছে বুঝি?' বছরখানেক পরে সেই দাদাটির বিয়ে হল, নববধূর বাক্স খোলার সময় কৌতূহলী মেয়ের দল ভিড় করে ঘিরে দাঁড়ালেন, একে একে বাক্সের মধ্যে থেকে বেরোলো—সেমিজ, জ্যাকেট, পেটিকোট, মোজা এবং জুতো। সেই চপেটাঘাতের কথা বোনটি কিন্তু ভোলেনি—সে গিয়ে তার দাদাকে চ্যালেঞ্জ করল, 'যাও না, এইবার বউরে ধইর‍্যা মারো দেখি!' এর [পর] সে বাড়ির সব মেয়েদের গায়ে জামা উঠতে যে দেরী হল না, সেকথা বলা বাহুল্য।

কিছু বাংলা লেখাপড়া কিন্তু আমাদের বাড়িতেও সব মেয়েরাই জানতেন—কোন নূতন বৌ যদি লিখতে পড়তে না জানতো, তবে তাকে শিখিয়ে নেওয়া হত। নানা রকম সুন্দর শিল্পকাজও তাঁরা করতেন—সূক্ষ্ম সেলাই, কাগজ কাটা, মাটির ও পাথরের ছাঁচ খোদাই করা, আলপনা আঁকা, পট চিত্র করা, কতরকম হাতের কাজের মধ্যে কারো কারো এমন নৈপুণ্য ও সৌন্দর্যবোধ দেখা যেতো ; তাঁরা যদি উপযুক্ত শিক্ষা পেতেন, তবে উঁচুদরের আর্টিস্ট হতে পারতেন! শিখবার তো আর কোন ব্যবস্থা ছিল না—গৃহিণীদের মধ্যে যিনি যে কাজে, তাঁর কাছ থেকেই কন্যা ও বধূরা দেখাদেখি শিখে নিতেন।

আমাদের মা[৮] ছিলেন নূতন যুগের মানুষ। স্কুল কলেজে পড়বার সুবিধা তিনি পাননি, কিন্তু বাড়িতেই দাদামশাইয়ের কাছে সুন্দর শিক্ষা পেয়েছিলেন—মিশনারী মেমের কাছে ইংরাজিও শিখেছিলেন। নূতন আদর্শেই তাঁর মন গঠিত হয়েছিল। তখনকার আধুনিক বেশেই তিনি বাহিরে সভাসমিতি ও সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন, কিন্তু বাহিরের চেয়ে লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে নীরবে কাজ করতেই তিনি ভালবাসতেন। ছায়ার মত সর্বদা আমাদের বাবার সঙ্গে থেকে, তাঁর সব কাজে মা সহায়তা করতেন। নিজের ছয়টি সন্তান[৯] ছাড়াও আরও কয়েকটি শিশুকে তিনি সন্তানের মতই স্নেহ মমতায় ঘিরে মানুষ করেছিলেন। যে কেউ আমাদের বাড়িতে আসতেন, মায়ের সেবাযত্নে ও মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে যেতেন। পরকেও তিনি সহজে আপনার করে নিতে পারতেন। দেশী-বিদেশী নানারকম রান্না ও খাবার করে সবাইকে খাওয়াতে তাঁর ভারী আনন্দ ছিল—আজও কত লোকের মুখে আমার মায়ের হাতের রান্না ও আদরযত্নের কথা শুনতে পাই। বেশভূষা তাঁর শোভন ও আধুনিক-রুচিসম্মত। কিন্তু একেবারে সাদাসিধা ছিল—নিজের ভাল কাপড় ও গহনা দিয়ে অন্যদের সাজিয়েই তিনি বেশী তৃপ্তি পেতেন।

তখনকার আধুনিকাদের বেশভূষা এখনকার আধুনিকাদের কাছে নিতান্তই 'সেকেলে' মনে হবে। ভিক্টোরিয় যুগের ইংরাজ মেয়েদের মত অনেক কুঁচি, ফ্রিল ও লেসের ঝালর দেওয়া জ্যাকেটের উপর, কয়েকটা পার্সি ধরনের কাপড় পরতেন (এই রকম শাড়ি পরার

রীতির নাম ছিল 'ব্রাহ্মিকা ফ্যাশন')। মাথায় ঘোমটা দিতেন না, কিন্তু মাথার কাপড় যাতে সরে না যায়, সেজন্য পিন দিয়ে আটকিয়ে নিতেন—বাইরে যাবার সময় জুতো মোজা পায়ে দিতেন, কেহ কেহ মাথায় একটা ভেল্ ব্যবহার করতেন। অলঙ্কারের বাহুল্য ছিল না, কৃত্রিম প্রসাধনের চলন ছিল না। মোটের উপর, তাঁদের বেশভূষার মধ্যে শালীনতা ও সম্ভ্রমবোধ বজায় থাকতো।

মেয়েদের একলা বেরোনো, কিংবা রাস্তায় হেঁটে যাবার নিয়ম ছিল না, সকলেই গাড়ি চড়ে যেতেন—তফাৎ-এর মধ্যে এই ছিল যে, যাঁরা পর্দা মানতেন, তাঁরা ঘোমটা টেনে, গাড়ির জানলা বন্ধ করে যেতেন, আর আধুনিকারা জানলা খোলা রাখতেন। 'আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে' দেখা না গেলেও, মাঝে মাঝে খোলা ফিটন[১০] কিংবা ল্যাণ্ডো[১১] গাড়িতে চড়তে তাঁদের দেখা যেতো। তখনও দেশের জনসাধারণের মন স্ত্রী-স্বাধীনতার অনুকূল ছিল না, কাজেই তখনকার আধুনিকারা সর্বদা কোনও পুরুষ অভিভাবকের সঙ্গে বেরোতেন, মান সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্য বেশ গম্ভীর, সংযতভাবে চলাফেরা করতেন—বাহিরের লোকে অনেক সময় সেটা তাঁদের অহঙ্কার বলে ভুল করতেন।

শিক্ষিতা আধুনিকারা নিজেদের ঘর সংসার অবহেলা করেন, ঘরের কাজ করতে তাঁরা অপমান বোধ করেন—বাহিরের লোকেদের কাছে এ রকম দুর্নামও তাঁদের রটেছিল। কিন্তু শুধু বিদ্যালাভ করে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ানোই এই সব শিক্ষিতা আধুনিকাদের উদ্দেশ্য ছিল না—সুগৃহিণী ও সুমাতা হতে, স্বামীর যথার্থ সঙ্গিনী হতেই তাঁরা চেয়েছিলেন। সুশিক্ষার মধ্যে দিয়ে চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ হবে, গৃহকর্ম, সন্তানপালন, স্বাস্থ্যতত্ত্বের জ্ঞানলাভ করে সুন্দর ও সুনিপুণভাবে সংসার চালাতে, কুসংস্কার ও সামাজিক কুপ্রথার বন্ধনমুক্ত হয়ে মন উদার হবে, গৃহের বাইরেও সেবা ও কর্মের ক্ষেত্র প্রশস্ত হবে, এই আকাঙ্ক্ষাই তাঁদের মনে ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষত 'ফ্যাশনেবল' ধনীসমাজে এর ব্যতিক্রম দেখা গেলেও আমরা যাঁদের ঘনিষ্ঠভাবে জানতাম, যাঁদের হাতে মানুষ হয়েছিলাম, যাঁদের কাছে শিক্ষালাভ করেছিলাম, তাঁদের মধ্যে এই রকমই দেখেছিলাম। ত্যাগ ও সেবার আদর্শ তাঁরা ভুলে যাননি, নূতন যুগে সেই আদর্শেরই একটা নূতন রূপ তাঁরা দেখেছিলেন।

রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ জুলাই, ১৯৬৪

স্কুল-কলেজ

পড়াশোনা শুরু হল। একে 'বালিকা বিদ্যালয়', তায় 'ব্রাহ্ম'—রাস্তায় আমাদের বাস্ দেখলে অনেকে মাঝে মাঝে টিট্‌কারি দিত। বালিকা বোর্ডিংটির নাম রেখেছিল, 'অবলা-ব্যারাক'। যা-ই হোক, একটু নতুন ধরনের একটা আদর্শ স্কুল বলে আমাদের ছোট্ট স্কুলটির বেশ সুনাম ছিল।[১২] লেখাপড়ার সঙ্গে 'নীতি শিক্ষা', গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, সেলাই ও নানারকম হাতের কাজ, গান, খেলা, ড্রিল ইত্যাদি অনেক কিছুর ব্যবস্থা ছিল, যা তখনকার দিনে অন্য স্কুলে খুব কমই দেখা যেতো। একটা প্রকাণ্ড বাড়ির একদিকে আমরা থাকতাম অন্যদিকে স্কুল হত, শিক্ষকশিক্ষিকারাও সকলেই চেনা মানুষ—বেশ একটা ঘরোয়াভাব ছিল এখানে। অধিকাংশই ব্রাহ্ম ও শিক্ষিত হিন্দুঘরের মেয়ে, দু চারটি মুসলমান মেয়েও ছিল। নেপাল, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ প্রভৃতি ভিন্ন প্রদেশের মেয়েও কয়েকটি ছিল। অনেক সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে ছিল, তবে 'ফ্যাশনেব্‌ল' লোকেরা এখানে মেয়ে দিতেন না—তাঁদের মেয়েরা লরেটোতে[১৩] পড়তো।

দিদি[১৪] আর মাসি[১৫] এই শিক্ষালয় থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাস করে বেথুন কলেজে[১৬] ভর্তি হল, সেই সঙ্গে আমরা দুটি ছোটবোনও[১৭] বেথুন স্কুলে[১৮] চলে এলাম। স্কুল ও কলেজ ছিল একই বাড়িতে। যার মোটা মোটা থাম দেখে অন্য স্কুলের ছেলেরা ছড়া বেঁধেছিল, 'বেথুন কলেজ, হ্যাজ্ নো নলেজ ; বড়া বড়া থাম, কুছু নেই কাম্।'

বেথুন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল তখন ছিলেন চন্দ্রমুখী বসু[১৯]। চন্দ্রমুখী বসু আর কাদম্বিনী বসু (পরে গঙ্গোপাধ্যায়) একসঙ্গে বি এ পাস করেছিলেন। শুধু ভারত নয়, সারা বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে তাঁরা প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট—কারণ তখনও অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন মহিলা গ্র্যাজুয়েট হননি। অশিক্ষিতা, অবহেলিতা বাঙ্গলার মেয়েদের দুরবস্থা দেখে বড় দুঃখেই কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তার কিছুকাল আগে এক তীব্র ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছিলেন, 'হায়, হায়, ওই যায় বাঙ্গালির মেয়ে!'[২০] কাদম্বিনী ও চন্দ্রমুখী বি এ পাস করার পর, হেমচন্দ্র তাঁদের অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছিলেন—

হরিণ নয়না শোন কাদম্বিনী বালা,
শোন ওগো চন্দ্রমুখী কৌমুদীর মালা,
যে দুঃখেতে লিখেছিনু
'বাঙ্গালির মেয়ে',
তারি সম সুখ আজি
তোমা দোঁহে পেয়ে।[২১]

কাদম্বিনী বেশ সুন্দরী ছিলেন, চন্দ্রমুখী সুন্দর ছিলেন না। তাঁর শ্যামবর্ণ, সুগোল মুখখানি দেখে একবার নাকি কোন্ বখাটে ছাত্রদল 'চাঁদে গেরোন লেগেছে রে!' বলে শাঁখ ঘণ্টা বাজিয়েছিল। কিন্তু সেই গম্ভীর মুখে এমন একটি বুদ্ধির দীপ্তি আর আত্মমর্যাদাবোধের প্রশান্ত শ্রী ছিল, যাতে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম জাগতো। দূর থেকে তাঁকে দেখে প্রথমে কেমন ভয়

হয়েছিল—কাছে গিয়ে কথাবার্তা বলে, খুব ভাল লাগলো। অতিশয় দক্ষতা ও যোগ্যতার সঙ্গে তিনি স্কুল ও কলেজ চালাতেন—ঘড়ির কাঁটার মত নিয়মে সমস্ত চলতো, কোথাও এতটুকু শৃঙ্খলা বা পরিচ্ছন্নতার অভাব থাকতো না। দুঃখের বিষয়, এর দু'বছর পরেই তিনি কাজে অবসর নিয়ে চলে গেলেন।

চন্দ্রমুখী ছিলেন খৃশ্চান মহিলা। স্কুলের শিক্ষিকা ও কলেজের অধ্যাপিকাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ব্রাহ্ম, শুধু একজন খৃশ্চান ও একজন হিন্দু বিধবা ছিলেন। এঁরা সবাই যে কুশ্রী বা কুরূপা ছিলেন তা নয়, কিন্তু এঁদের আকৃতি প্রকৃতি ছিল যেন এক ছাঁচে ঢালা। গম্ভীর 'ভারিক্কি' চেহারা, পরনে সাদা শাড়ি ও লম্বা আস্তিনের বন্ধ-গলা জামা, চুলগুলিকে বেশ টান করে মাথার পিছনে শক্ত একটি ছোট খোঁপা বাঁধা, অলঙ্কার বা প্রসাধনের বালাই নাই, বরং স্বাভাবিক রূপটাকেও যেন শ্রীহীন করে ঢেকে রাখবার চেষ্টা! কথা বলেন কম, হাসেন আরও কম—মনের স্বাভাবিক স্ফূর্তিকে গাম্ভীর্যের গুরুভার দিয়ে চেপে রাখেন। এই সব 'গম্ভীরা ব্রাহ্মিকা মূর্তি' নিয়ে অনেকে উপহাস করতেন, কিন্তু বাহিরের ঐ নীরস কঠিন আবরণের নীচে, তাঁদের স্নেহ-কোমল অন্তরের পরিচয় আমরা পেয়েছিলাম, তাঁদের অনেক গোপন দান, পরোপকার ও স্বার্থত্যাগের কাহিনীও অন্যদের মুখে শুনেছিলাম। দীর্ঘকাল বোর্ডিংয়ে একটা রুটিনের মধ্যে থেকে, জীবনটা একঘেয়ে হয়ে পড়ে। ঘন্টার পর ঘন্টা ক্লাসে পড়িয়ে ও খাতা দেখে, মনে ক্লান্তিবিরক্তি আসে—মেজাজটাও মাঝে মাঝে রুক্ষ হয়ে ওঠে ; কিন্তু সেটাই তাঁদের আসল পরিচয় নয়। তাঁদের মধ্যে ঐকান্তিক আদর্শনিষ্ঠা, কর্তব্যজ্ঞান ও দায়িত্ববোধ ছিল, শিক্ষাদান করাকে তাঁরা জীবনের ব্রত বলেই অবলম্বন করেছিলেন।

স্কুলের নীচের ক্লাসগুলিতে মেয়ে ধরতো না। কতগুলি ছোট ছোট মারোয়াড়ী মেয়েও ছিল, ক্লাসের মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া হলে তারা গালি দিত—'মচ্ছিখোর বংগালি!' এদের মধ্যে অর্ধেক মেয়েও কিন্তু উপরের ক্লাস পর্যন্ত পৌঁছাতো না—একটুখানি লেখাপড়া না জানলে বিয়ের বাজারে মেয়ে অচল হত, তাই 'নাম্‌কে ওয়াস্তে' এদের স্কুলে পাঠানো—দশ বারো বছর বয়সেই অনেকের বিয়ে হয়ে যেতো।

অনেক সময়ে দেখা যেতো যে, মেয়ের বাবার ইচ্ছা মেয়েকে পড়াতে, কিন্তু মা-ঠাকুরমাদের ইচ্ছা মেয়ের বিয়ে দিতে। একটি হিন্দু মেয়ের বাবার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তার মা আর ঠাকুরমা মিলে বিয়ের সমস্ত আয়োজন করে ফেলেছিলেন—হঠাৎ মেয়ের বাবা আগেই ফিরে আসাতে সব পণ্ড হয়ে গেল! ভদ্রলোক আবার তাকে বোর্ডিংয়ে রেখে গেলেন, আর বলে দিলেন যে, তিনি নিজে না এলে আর কারো হাতে যেন মেয়েকে ছাড়া না হয়।

বিবাহিতা মেয়েও কয়েকটি ছিল। একটি সাত আট বছরের বৌ একগলা ঘোমটা দিয়ে, মল ঝম্‌ঝম্ করে গাড়িতে উঠতো। আরেকটি আঠারো বছরের বৌ, নীচের ক্লাসের ছোট ছোট মেয়েদের মধ্যে সঙ্কুচিতভাবে পিছনের বেঞ্চে বসে থাকতো। অনেক কষ্টে নিজের চেষ্টায় দ্বিতীয় ভাগ পর্যন্ত পড়েছে, ইংরাজি বর্ণপরিচয় মাত্র হয়েছে, কিন্তু লেখাপড়া শিখবার তার অদম্য চেষ্টা ও উৎসাহ। কয়েক বৎসর পরে, স্বামীর অসুখের জন্য মেয়েটি

স্কুল ছেড়ে গেল—পরে শুনলাম, সে বিধবা হয়েছে। প্রায় বিশ বৎসর পরে তার সঙ্গে হঠাৎ আবার দেখা—ক্যাম্‌বেল্ মেডিকেল স্কুল[২২] থেকে পাস করে সে ডাক্তার হয়েছে, তারপর দুবার বিলাতে গিয়ে দুটো ডিপ্লোমা এনেছে, এবার তৃতীয়বারে জার্মানী যাবার উদ্যোগ করছে।

আমাদের ক্লাসের একটি মেয়ে কলেজে উঠবার পরে আর বাড়ি যেতো না—তার বাবা নিতে এলে তাঁকে ফিরিয়ে দিত, তারপর বসে অঝোরে কাঁদত! এ রকম অদ্ভুত ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলেছিল, 'বাড়ি গেলেই জোর করে বিয়ে দিয়ে দেবে! আমি বি এ পাস করার আগে কিছুতেই বিয়ে করবো না।' একেই মেয়েদের মন নরম হয়েছিল, তার উপর আবার এর মধ্যে রোমান্সের গন্ধ পেয়ে সকলের আগ্রহ আর সহানুভূতি বেড়ে গেল। কোনও বন্ধু পরিবারের একটি ছেলের সঙ্গে মেয়েটির পরিচয় হয়েছিল, ক্রমে তাদের মন পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হল, কিন্তু তাদের মিলনের পথে মস্ত বাধা—মেয়ের বাবা ধনী লোক, আর ছেলেটি অন্য সব বিষয়ে ভাল হলেও, গরীব, অনেক চেষ্টায় আমেরিকায় গিয়ে ছেলেটি সেখানে চাকরি করে নিজের পড়ার খরচ চালাচ্ছে—আশা আছে যে, যোগ্যতা অর্জন করে ফিরতে পারলে মেয়ের বাবামায়ের সম্মতি পাবে। সেই প্রতীক্ষায় রয়েছে মেয়েটি। এদিকে ষোলো সতের বছরের মেয়েকে অবিবাহিত রাখার জন্য সমাজে নিন্দা হচ্ছে, সুন্দরী ধনীকন্যার জন্য সম্বন্ধও আসছে চার দিক থেকে, সকলেই বিবাহের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন—তাই মেয়েটি বোর্ডিংয়ের নিরাপদ দুর্গের মধ্যে আত্মরক্ষা করছে! সুখের বিষয়, সে তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পেরেছিল—বি এ পাস করার পরে, বাঞ্ছিত পাত্রের সঙ্গেই তার বিয়ে হয়েছিল।

একটি মাঝারি রকম হল-এর মধ্যেই কলেজের ফার্স্ট থেকে ফোর্থ ইয়ার ক্লাস হত—চার কোণে চারটি ক্লাস, মাঝখানে প্রিন্সিপ্যালের অফিস টেবল্! এক ক্লাসে একটু জোরে কথা হ'লে, অন্য ক্লাসের অসুবিধা হত। তবু রক্ষা যে, ক্লাসগুলি ছিল ছোট। আমাদের ফার্স্ট ইয়ারে ষোলটি মেয়ে হয়েছিল, তাতেই সকলে কত খুসী—'এবারে অনেক ছাত্রী হয়েছে।' বেঞ্চগুলি এমনভাবে সাজানো ছিল যে, দুই ক্লাসের মেয়েরা 'মুখোমুখি' থাকতো, প্রফেসররা পরস্পরের দিকে পিছন ফিরে থাকতেন। সবেমাত্র স্কুল থেকে এসেছি, তখনও ছেলেমানুষী যায়নি—আমাদের ক্লাসে প্রফেসরের অনুপস্থিতিতে আমরা সামনের ক্লাসের মেয়েদের নানারকমে হাসাবার চেষ্টা করতাম—তাদের প্রফেসর পিছন ফিরে থাকাতে ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারতেন না! যখন বোঝা গেল, তখন বেঞ্চগুলোকে ঘুরিয়ে দেওয়া হল। একই ঘরের মধ্যে ছিল লাইব্রেরী এবং প্রফেসরদের কমনরুম, সুতরাং লাইব্রেরীতে বসে বই পড়বার সুবিধাও আমাদের ছিল না।

উদ্ভিদবিজ্ঞান ছাড়া অন্য কোন বিজ্ঞান পড়বার ব্যবস্থা ছিল না—বিজ্ঞানের দিকে মেয়েদের বিশেষ আগ্রহও দেখা যেতো না। 'বটানি' পড়াতেন আচার্য জগদীশচন্দ্রের ভগ্নী হেমপ্রভা বসু।[২৩] চমৎকার পড়াতেন, কিন্তু পরীক্ষার কয়েক মাস আগে হঠাৎ তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন—তাঁর বদলে অন্য লোকও পাওয়া গেল না। প্রেসিডেন্সী কলেজের জনৈক অধ্যাপক বলেছিলেন যে, আমরা যদি যাওয়া আসার ব্যবস্থা করতে পারি, তবে

তিনি তাঁর কলেজের ক্লাসের সঙ্গে আমাদেরও পড়াবেন : কিন্তু কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করলেন না। আমাদের কয়েক বৎসর আগে তিনচারজন মেয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে এম এ পড়েছিলেন, আর আমাদের ভাগ্যে সামান্য এটুকু সুযোগও হল না বলে মনে ভারি দুঃখ হয়েছিল। এখন নাতনীদের প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়তে দেখে, সেই ষাট বছর আগেকার কথা মনে পড়ে।

কলেজে কয়েকটি ইহুদী এবং অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েও ছিল : দুটি বোন ছিল 'আফ্রো-ইণ্ডিয়ান'—তাদের বাবা নিগ্রো, মা বাঙ্গালি। দেশী খৃশ্চান মেয়েদের মধ্যে অনেকে গাউন পরতো ; প্রায় সকলেরই একটা করে বাঙ্গালা নাম আর একটা ইংরাজি 'খৃশ্চান নেম্' থাকতো—যারা বাঙ্গালি থাকতে চাইতো তারা বাঙ্গালা নামটাকে প্রাধান্য দিত, আর যারা 'মেমসাহেব' হতে চাইতো, তাদের ইংরাজি নামটাই প্রধান হত। একটি শান্তশিষ্ট শাড়িপরা মেয়ে, নামটা—ধরুন, তরুবালা এস্থার হালদার, লিখতো তরুবালা ই হালদার। পরীক্ষায় ফেল করে সে কলেজ ছেড়ে চলে গিয়েছিল, বছর দুই পরে হঠাৎ আবার গাউন পরে ফিরে এল—তখন তার নাম হয়েছে এস্থার টি হোল্ডার—সঙ্গে সঙ্গে মেজাজটাও বেশ মেমসাহেবী গোছের হয়ে গিয়েছে।

স্থানাভাব ও নানারকম সুযোগ-সুবিধার অভাব সত্ত্বেও কলেজে জীবনটা খুব আনন্দেরই ছিল। প্রাইজ দিবস বেথুন দিবস,[২৪] প্রাক্তন ছাত্রী সম্মেলনে—পুরানো ছাত্রীরা অনেকে উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিতেন। 'কলেজ ইউনিয়ন'-ও একটা হয়েছিল। প্রবন্ধ পাঠ, আলোচনা, খেলাধূলাতে শিক্ষিকারাও যোগ দিতেন—মেয়েদের প্রথম এবং তখন একমাত্র কলেজটির উন্নতির জন্য সকলেরই চেষ্টা ও আগ্রহ ছিল।

পুরাতন ছাত্রীদের মধ্যে, সরলাদেবী (পরে, চৌধুরানী)[২৫] প্রায়ই আসতেন—তাঁর স্বরচিত গান, রবীন্দ্রসঙ্গীত, বেদগান শিখিয়ে যেতেন। হিরণ্ময়ী দেবী[২৬] একবার আমাদের ইউনিয়নকে 'উপহার' দিয়ে গেলেন—বারো তেরো বছরের একটি মেয়ে! বললেন, 'এর মা-বোন নেই, তোমরাই একে দেখবে, চাঁদা করে এর সব খরচ চালাবে।' মেয়েটি বোর্ডিংয়ে রয়ে গেল, ছাত্রীরাই তার খরচপত্র চালিয়ে নিল।

সিস্টার নিবেদিতাকে[২৭] কলেজেই প্রথম দেখেছিলাম—ধীর, শান্ত, সহাস্য মূর্তি, চোখে স্বপ্নময় দৃষ্টি। ভারতীয় নারী জীবনের আদর্শের কথা বলতে বলতে চোখদুটি উজ্জ্বল হত, মুখখানি আনন্দ ও গৌরবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো।

একদিন শুনলাম, প্রথম মহিলা ব্যারিস্টার মিস কর্নেলিয়া সোরাবজী আসছেন।[২৮] এই আধুনিকা-'পোর্শিয়া' পার্সী মহিলাকে দেখবার জন্য সকলে উৎসুক হয়ে রইলাম। কর্নেলিয়া সোরাবজী এলেন যেন এক ঝলক বিদ্যুতের মত—ঝক্‌ঝকে পোশাক, চক্‌চকে প্রসাধন, তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল দৃষ্টি, দ্রুত চঞ্চল গতি। পাশের ক্লাসে ইংরাজির প্রফেসরকে জেরা করবার ধরনে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করছেন দেখে, আমাদের ক্লাসে পণ্ডিতমশাই কেমন হক্‌চকিয়ে গেলেন। বললেন, 'তোমরা বসে লিখতে থাকো, আমি—এই এক্ষুনি আসছি', কিন্তু তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠতে না উঠতেই—মিস সোরাবজী পৌঁছে গেলেন। ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি পড়ানো হচ্ছে?' 'অভিজ্ঞা—ন শকু—ন্তলম্' শুনেই 'ওহ্—স্যান্‌স্ক্রীট!' বলে,

আর দ্বিরুক্তি না করে তিনি অন্য ক্লাসে চলে গেলেন। পণ্ডিতমশাই আবার ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ে, নিজের মনেই বললেন, 'বাপ্‌রে!'

পড়াশোনা সাঙ্গ করে, বেশীর ভাগ মেয়েই ঘরসংসার করতেন—চাকরির মধ্যে, মেয়েদের পক্ষে শিক্ষা বিভাগে কাজ করাটাই প্রশস্ত ছিল। তবে আমার সমসাময়িক ছাত্রীদের মধ্যে যতদূর মনে পড়ছে, পাঁচজন ডাক্তার হয়েছিলেন, দুজন আইন পরীক্ষা পাস করেছিলেন—তার মধ্যে একজন কলকাতায় মহিলা ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। সাহিত্য, সমাজকল্যাণ এবং দেশসেবার ক্ষেত্রেও তাঁদের মধ্যে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কাজ করে গিয়েছেন।

রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ জুলাই, ১৯৬৪

স্কুল-কলেজের আবহাওয়ার বাইরের বিচিত্র নারীজগতের সঙ্গেও ক্রমে পরিচয় হয়েছিল। মেলামেশা করবার, পরকে আপন করে নেবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল আমাদের মায়ের; রোগীর সেবা, পথ্য তৈরী, শিশুর যত্ন, এসব কাজেও খুব দক্ষতা ছিল তাঁর ; পাড়াপ্রতিবেশী সকলেই মাকে ভালবাসতেন, আপদে বিপদে তাঁর শরণ নিতেন— তিনিও কোথাও কারো অসুখ, অভাব বা বিপদ শুনলেই সাহায্য করতে এগিয়ে যেতেন। এমনি করে অনেক বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে যাওয়া আসা চলতো, যাঁদের সঙ্গে আমাদের অন্য বিষয়ে মনের মিল ছিল না, অন্য কোনরকমে হয়তো যোগস্থাপন হত না।

আমাদের যেসব আত্মীয়রা রক্ষণশীল ছিলেন, তাঁরাও প্রায় সকলেই উচ্চশিক্ষিত ও উদারমনা ছিলেন—তাঁদের মধ্যে সংস্কৃতির ছাপ ছিল। কিছু রক্ষণশীল হলেও বাল্যবিবাহ, বিবাহে পণদান বা গ্রহণ ইত্যাদি সামাজিক কু-প্রথার তাঁরা বিরোধী ছিলেন। তাঁদের বাড়ির মেয়েরা বাহিরে বেরোতেন না, গৃহ-পরিবারের মধ্যেই তাঁদের জীবন সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু সেই গৃহকোণে তাঁদের একটা সম্মান ও মর্যাদার আসন ছিল—তাঁদের ইচ্ছা ও মতামতের কিছু মূল্য ছিল ; পুত্র ও কন্যার সেখানে সমান আদরযত্ন ছিল। অন্য অনেক পরিবারেও এইরকম দেখতাম। আবার এর উল্টো দিকটাও দেখতে পেলাম অনেক জায়গায়।

মেয়েদের হতাদর দেখে অবাক হয়েছিলাম এক প্রতিবেশীর বাড়িতে গিয়ে। সে বাড়িতে অনেকগুলি মেয়ে ছিল। বিকালে গৃহিণী নিজের হাতে কর্তা আর ছেলেদের জন্য রেকাবিতে জলখাবার সাজিয়ে পেয়ালায় চা ঢেলে দিতেন, মেয়েদের ভাগ্যে আসন-বাসন কিছুই জুটতো না—ঝী এসে রান্নাঘরের রোয়াকটা মুছে পরিষ্কার করে দিত, সিমেন্টের মেঝের উপরেই ঠাকুর মাথাপিছু দুখানা করে রুটি আর একটুখানি গুড় দিয়ে যেতো। মেয়েরা মেঝেতে পা ছড়িয়ে কিংবা উবু হয়ে বসে সেটুকু খেয়ে, কলতলায় গিয়ে আঁজলা ভরে জল খেয়ে নিত।

একটা বাড়ি আমাদের খুব ভাল লাগতো—সে বাড়ির মেয়েরা দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি চমৎকার তাঁদের কথাবার্তা ও ব্যবহার। বৃদ্ধা গৃহকর্ত্রী অল্প বয়সে বিধবা হয়ে, অনেক কষ্টে একমাত্র ছেলেটিকে মানুষ করেছিলেন, সেই ছেলে এখন কৃতী আর ধনী হয়েছেন। ধনেজনে পরিপূর্ণ সুখের সংসারে তাঁদের একটি বড় বেদনার কারণ—বালবিধবা নাতনীটি। বড় সাধ করে অষ্টম বর্ষে গৌরীদান করেছিলেন, কিন্তু দু বছর না যেতেই মেয়েটি বিধবা হল! মেয়ের এক কাকা বলেন, 'কিসের বিধবা? ওর তো বিয়েই হয়নি—বিয়ের নামে তোমরা একটা পুতুল খেলা করেছিলে। ওকে আমার কাছে দাও, আমি ওর আবার বিয়ে দেব—আমার ছেলেপিলে নাই, সমাজ আমাকে একঘরে করেই বা কি করবে?' মন তাই চায়, কিন্তু সাহসে কুলায় না! বিনা অপরাধে তাঁদের আদরিণী বালিকা জীবনের সব সুখ সাধ থেকে চিরকাল বঞ্চিত থাকবে, নিজেরাও দেখে দুঃখ পাবেন, কিন্তু সমাজের ভয়ে এর প্রতিকার করতে পারবেন না!

পাড়ায় এক নূতন প্রতিবেশী এলেন, তাঁদের একটি বৌকে কখনও হাসতে দেখতাম না—সর্বদাই ম্লান মুখ। গরীবের মেয়ে রূপের জোরে ধনী ঘরের বৌ হয়েছে, কিন্তু তার বাবা পণের টাকা সবটা দিয়ে উঠতে পারেননি, ধনী কুটুম্বের যোগ্য তত্ত্বও পাঠাতে পারেন না। এই নিয়ে ধনী বৈবাহিক নাকি তাঁকে এমন অপমান করেছিলেন যে, তিনি শপথ করেছিলেন আর কখনও সে বাড়িতে পা দেবেন না—'অমন কসাইয়ের ঘরে যখন মেয়ে দিয়েছি, তখন মনে করবো আমার মেয়ে মরে গিয়েছে।' রাজায় রাজায় যুদ্ধ হল, মাঝখান থেকে উলুখড়টি পুড়ে মরল। বাপের বাড়ির সঙ্গে সব সম্বন্ধ ছিন্ন হল, শ্বশুর বাড়িতে লাঞ্ছনা গঞ্জনার অন্ত রইল না—নিরীহ দুর্বলচিত্ত স্বামীর মনে হয়তো কিছু দয়ামায়া আছে, কিন্তু প্রতিকার করবার সামর্থ্য নাই, প্রতিবাদ করবারও সাহস নাই! কিছুদিন পরে, মৃত্যু এসে তাকে শান্তি দিল।

যাঁরা পুত্রবধূর সঙ্গে এরকম হৃদয়হীন ব্যবহার করলেন, তাঁদেরই কন্যাকে দেখলাম, শাশুড়ির নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে বাপের বাড়িতে পালিয়ে আসতে। অপরাধ তার গুরুতর—পর পর পাঁচটি কন্যা সে তাঁদের উপহার দিয়েছে, বংশধর পুত্রসন্তান দেবার নামটি নাই।

বাড়ির ভিতরের সব কাজের ব্যবস্থা সাধারণত মেয়েদের হাতেই থাকে, মেয়েরা যদি অশিক্ষিতা এবং কুসংস্কারে অন্ধ হন, তাহলে কতরকম বিভ্রাট ঘটে। এক ধনীর বাড়িতে একমাত্র পুত্রবধূর পর পর তিনটি সন্তান সূতিকাগৃহেই মারা গেল। মন্ত্র-মাদুলী-তাবিজে কোন ফল হল না। অবশেষে লেডী ডাক্তার ডাকা হল—ডাক্তার দেখে বললেন, 'বৌমার স্বাস্থ্য বেশ ভাল, চিকিৎসার কোনই দরকার নাই, কিন্তু আপনাদের ঐ আঁতুড় ঘরটি না বদলালে একটিও ছেলে বাঁচবে না।' প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদের মত বাড়ির তিন-তলায় গৃহদেবতা বাস করেন, তবুও 'ছোঁয়া-নেপায়' ঠাকুরের অপবিত্র হবার ভয়ে 'আঁতুড় ঘর' করা হয় গোয়াল ঘরের পাশে একটি অন্ধকার স্যাঁতসেতে ঘরে!

বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে এইরকম কত দৃশ্য দেখে বুঝলাম যে, আমাদের দেশে কয়েকশত মেয়ে শিক্ষিতা হলেও আরো কত শতগুণ মেয়ে শিক্ষার অভাবে এবং নানারকম কুসংস্কার ও সামাজিক কুপ্রথার অধীনে কত দুঃখ দুর্দশা ভোগ করেন—প্রতিকারের কোন উপায় না দেখে তাঁরা নিজেদের ভাগ্যকেই দোষ দেন। কতজনকে বলতে শুনতাম 'আপনারাই বেশ আছেন! আমাদের সমাজে মেয়ে হয়ে জন্মানোটাই হচ্ছে পূর্বজন্মের পাপের ফল!' কিন্তু, নিজেরা দুঃখ ভোগ করেই কি সব সময় তাঁরা অন্যের দুঃখ বুঝতে শিখতেন? একটা কথাই আছে, 'যে বৌ শাশুড়ির হাতে মার খায় কালে সেই আবার "বৌ কাঁটকি শাশুড়ি" হয়!' মেয়ের বিয়ে দিতে যে মায়ের প্রাণান্ত হল, তিনিই আবার ছেলের বিয়েতে তার শোধ তুলে নিতে চান!

বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহ[২৯] প্রচলনের প্রাণপণ চেষ্টা করলেও রক্ষণশীল সমাজ তা গ্রহণ করেনি; সুতরাং ইচ্ছা থাকলেও অনেকে সমাজের ভয়ে বালবিধবা মেয়ের বিয়ে দিতে পারতেন না—ব্রাহ্মসমাজে বিধবা বিবাহ নিন্দনীয় ছিল না বলে, কেহ কেহ গোপনে ব্রাহ্মসমাজে মেয়ে দিয়ে যেতেন। আমাদের খুব পরিচিত একটি বালবিধবা মেয়েকে তার

শ্বশুর নিজে নিয়ে এসে রবীন্দ্রনাথের কাছে রেখে যান—শান্তিনিকেতনে লেখাপড়া শেখার পর খুব সুপাত্রের সঙ্গেই তার বিয়ে হয়েছিল।

বিধবা মায়ের বিয়ে দেবার যে বিদ্রূপ সে যুগে প্রচলিত হয়েছিল তার মূলে কিন্তু একটা সত্য ঘটনা ছিল। একজন শিক্ষিত, পদস্থ ভদ্রলোক প্রৌঢ় বয়সে বিপত্নীক হওয়ার পরে তাঁর বৃদ্ধা মা একমাত্র ছেলেকে আবার বিবাহ করবার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করেন ; অনুরোধ ও অশ্রুজলে ফল হল না, অবশেষে আত্মহত্যা করবার ভয় দেখিয়ে তিনি ছেলেকে রাজি করালেন। বিয়ে করার পরেই কিন্তু ভদ্রলোকের মনে ভারী অনুশোচনা জাগল। এর অল্পদিন পরেই কঠিন রোগ হয়ে তিনি মারা গেলেন। মৃত্যুশয্যায় তাঁর প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে আর মেয়েকে কাছে ডেকে বললেন—'মায়ের আদেশে আমি বড় অন্যায় কাজ করে ফেলেছিলাম, তার প্রায়শ্চিত্তের ভার তোমাদের হাতে দিয়ে যাচ্ছি—এই মেয়েটি তো তোমাদের "মা" নয়, একে তোমরা মেয়ের মতই মনে করো, লেখাপড়া শিখিয়ে, এর আবার বিয়ে দিয়ো।' তাই বালিকা বিমাতাকে তাঁরা লেখাপড়া শিখিয়ে যোগ্য পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। সেই মহিলাকে মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসতে দেখতাম—তখন তিনি স্বামী-পুত্র নিয়ে সুখে ঘরসংসার করছেন।

সব নারীকেই তো দুঃখ-নিগ্রহ ভোগ করতে হত না, অনেকেরই সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটতো এবং তাতেই তাঁরা পরিতুষ্ট থাকতেন ; স্বামী-পুত্র-পরিজন নিয়ে ঘর-সংসার করবে, মেয়ে-মানুষের জীবনে এর চেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা কী থাকতে পারে? লেখাপড়া শেখা, পুরুষ মানুষের মতন বাইরে বেরোন, এসব 'বিবিয়ানাকে' তাঁরা মেয়েমানুষের পক্ষে বাড়াবাড়ি বলেই মনে করতেন।

কিন্তু সোনার খাঁচার মধ্যে বাস করেও, মুক্ত আকাশের দিকে চেয়ে পাখি যেমন ডানা ঝাপটায় তেমনি নিজের ঘরের মধ্যে আদরযত্নে থেকেও কোন কোন নারীর মন ছট্‌ফট্ করতো—বাহিরের বিচিত্র জগৎটাকে একটুখানি জানবার জন্য, শত বিধি-নিষেধ কুসংস্কার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে মনের জড়তা ও সংকীর্ণতা কাটিয়ে উঠবার জন্য, তাঁদের প্রাণ আকুল হত—দুঃখ করে বলতেন, 'শুধু "মেয়েমানুষ" হয়েই রইলাম, পুরো "মানুষ" হতে পারলাম না!' সম্ভ্রান্ত মুসলমান মহিলাও আফ্‌শোষ করতেন, 'মা, খোদার দুনিয়াতে এলাম, কিন্তু দুনিয়াটা যে কী, তার কিছুই দেখলাম না, জানলাম না।'

শিক্ষিতা মেয়েরা চিন্তা ও মনের স্বাধীনতা অনেকটা পেতেন, দুনিয়ার পরিচয়ও কিছু জানতে পারতেন, তবে তাঁদের চলাফেরার স্বাধীনতা এখনকার মেয়েদের তুলনায় অনেকটা সীমাবদ্ধ ছিল। বাবা, কাকা, কিংবা ভাইদের সঙ্গে আমরা কত জায়গায় বেড়াতাম, কত কিছু দেখতাম, কিন্তু মেয়েদের একলা বেরোবার, ট্রামগাড়িতে চড়ে (বাস তখনও হয়নি) কিংবা পায়ে হেঁটে যাওয়ার নিয়ম তখনও ছিল না।

নিজেদের গাড়ি তো অল্প লোকেরই থাকে। গাড়ি ভাড়ায় বেশী খরচ করবার ক্ষমতাও সকলের থাকে না—অথচ মান-সম্ভ্রমের প্রশ্ন ওঠে বলে অনেক মেয়েদের হয় কষ্ট করেও গাড়ি ভাড়া দিতে হত, নয়তো তাঁদের যাওয়াই হত না। কয়েকজন মেয়ে মিলে স্থির

করলেন যে, কাছাকাছি কোথাও যেতে হলে তাঁরা গাড়ি চড়বেন না, বাড়ির ছেলেদের সঙ্গে হেঁটেই যাবেন—তাঁরা পথ দেখালে, ক্রমে মেয়েদের রাস্তায় হেঁটে যাওয়ার চলন হয়ে যাবে। এই দলে আমরাও যোগ দিয়েছিলাম।

আমরাই যে প্রথম এই কাজে পথ দেখালাম, তা কিন্তু নয়—আমাদেরও প্রায় চল্লিশ বছর আগে, কয়েকজন সাহসিকা প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে হেঁটে গিয়ে, পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিলেন। তাঁরা উচ্চশিক্ষিতাও ছিলেন না, অধিকাংশই ছিলেন মধ্যবিত্ত ঘরের অশিক্ষিতা বা অল্পশিক্ষিতা কুলবধূ। তাঁদেরই কারো কারো মুখে মুখে আমরা সেই কাহিনী শুনেছিলাম—

নতুন যুগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, একদল উৎসাহী যুবক যখন প্রাচীন সমাজের কুপ্রথাগুলি মেনে চলতে অস্বীকার করেছিলেন, তখন সমাজ তাঁদের বর্জন করেছিল—তাঁদের মধ্যে অনেকেই পিতার ত্যাজ্যপুত্র হয়েছিলেন। গৃহ ও সমাজ ছেড়ে যখন তাঁরা চলে এলেন, তাঁদের পত্নীরাও—কেহ আদর্শের টানে, কেউ বা শুধু প্রাণের টানেই—তাঁদের অনুগামিনী হলেন। এঁদের সকলের বিদ্যাবুদ্ধি বেশী না থাকলেও, আগ্রহ ও উৎসাহ কিছু কম ছিল না—স্বামীর আদর্শ অনুসরণ করে চলবার, সব বিষয়ে তাঁর সহায়তা করবার, প্রাণপণ চেষ্টা করতেন তাঁরা। স্বামীরা স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী, পর্দাপ্রথার বিরোধী—সুতরাং স্ত্রীরা স্থির করলেন যে, তাঁরা পর্দাপ্রথার প্রতিবাদস্বরূপ বিনা অবগুণ্ঠনে প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে হেঁটে যাবেন। সমস্যা বাধল পোশাক নিয়ে— 'ব্রাহ্মিকা শাড়ির' উদ্ভব তখনও হয়নি, তখন মেয়েদের শাড়ি পরার যে রীতি ছিল, তাতে শালীনতা বজায় থাকে না, অগত্যা তাঁরা বিলাতি পোশাকের শরণ নিলেন। মেম্‌সাহেবের মত গাউন পরে ছোট একটি ওড়না বুকে মাথায় জড়িয়ে নিলেন, জুতো মোজা পায়ে দিলেন, তারপর কয়েকজন, দল বেঁধে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চললেন—একজনের পায়ের জুতোটা ঢিলা ছিল, বার বার খসে যাচ্ছিল, তাই তিনি সেটাকে ফিতা দিয়ে বেশ করে পায়ের সঙ্গে বেঁধে নিয়েছেন—তাই দেখে রাস্তার লোক একজন আরেকজনকে ডেকে বললেন, 'দ্যাখ্ দ্যাখ্ "Country-মেম" যাচ্ছে!' সরলা পল্লীনারী ইংরাজি বোঝেন না, কথাটাকে মস্ত 'কম্‌প্লিমেন্ট' মনে করে ভারি খুসী হলেন—বাড়ি ফিরে স্বামীকে বললেন, 'আমারে "কান্তি-ম্যাম্" কইছে!'

এসব কথা শুনে আমরা যেমন হাসতাম, বলতে গিয়ে সেই প্রাচীনারাও তেমনি হাসতেন। বলাই বাহুল্য যে, তাঁদের সেই 'পাগলামিটা' ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল। এতকাল পরেও, আমরা যখন প্রথম রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতাম—লোকে অবাক হয়ে চেয়ে দেখতো! প্রথম যখন কলকাতায় ইলেকট্রিক ট্রাম হল, আমরা তিন বোনে একদিন শখ করে বাবার সঙ্গে ট্রামে চড়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম—তখন লোকের কাছে নতুন ট্রামের চেয়ে আমরাই বেশী নতুন 'দ্রষ্টব্য' হয়েছিলাম। 'স্ত্রী-শিক্ষা' ততদিনে লোকের সহ্য হয়ে গেলেও, 'স্ত্রী-স্বাধীনতা' তখনও তাঁদের চোখে যেন সহ্য হচ্ছিল না।

মেয়েদের উচ্চ-শিক্ষা না হোক, অন্তত কিছুটা শিক্ষা দেবার উপকারিতা ও কার্যকারিতা ক্রমে লোকে বুঝতে পারছিল, মেয়েরা নিজেরাও এ বিষয়ে একটু একটু করে সচেতন

হচ্ছিলেন—শহরে ও মফঃস্বলে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা একটি-দুটি করে বাড়ছিল, বয়স্থা বিবাহিতা মেয়েদের জন্য অন্তঃপুর-শিক্ষার ব্যবস্থাও হয়েছিল।

রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯ জুলাই, ১৯৬৪

বঙ্গভঙ্গ

হঠাৎ সেই মরাগাঙে বান্ এসে গেল!

সমস্ত দেশবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে, জোর করেই ইংরাজরাজ বাংলাদেশকে দুই ভাগ করলেন—অবসাদসুপ্ত বাঙ্গালি যেন তীব্র কশাঘাতে সচেতন হয়ে উঠল! দেশময় দারুণ বিক্ষোভ ও তুমুল উত্তেজনা দেখা দিল—বিদ্যুৎ-প্রবাহের মত সে আবেগ প্রাণে প্রাণে সঞ্চারিত হল—ধনী দরিদ্র জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত বাঙ্গালি দৃঢ়পণ করল যে, মানচিত্রে তাদের দুই ভাগ করলেও মনে-প্রাণে বাঙ্গালি জাতি এক থাকবে।

নেতারা অগ্নিময়ী ভাষায় জনগণকে দেশসেবায় উদ্বুদ্ধ করলেন, কবিরা গানে গানে তাদের প্রাণে দেশ-প্রেমের বন্যা এনে দিলেন—ঘরে ঘরে লোকের মুখে মুখে, সে গান শহর থেকে শহরে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ে, কোটি কণ্ঠে ধ্বনিত হল। সে প্লাবনতরঙ্গ অন্তঃপুরেও পৌঁছিয়ে গেল। পাড়ায় পাড়ায় মেয়েদের সভা বসল—যাঁরা কোনদিন ঘরের বাহির হতেন না, নিজেদের ছোট্ট গণ্ডীটুকুর বাহিরে কোন খবর রাখতেন না, তাঁরাও দলে দলে সভায় যোগ দিলেন—সাধ্যমত অর্থ সাহায্য ছাড়া অনেকে গায়ের গহনা খুলে দিলেন। আমাদের অঞ্চলে, গ্রীয়ার পার্কে (পরে মহিলা পার্ক)[৩০] জনসভা হত—পাশেই ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়, শত শত পর্দানসীন মহিলার ভীড় হত, সুরেন্দ্রনাথ,[৩১] বিপিন পাল[৩২] প্রভৃতির বক্তৃতা শুনবার জন্য।

আশ্বিন, বঙ্গ বিভাগের দিন[৩৩]—বাঙ্গালির কাছে সেটি একতা ও মিলনের দিন। সেদিনের কথা ভুলবার নয়। ভোর না হতেই দলে দলে লোক বাড়ি বাড়ি ঘুরে 'রাখি-বন্ধন' করবার জন্য বেরিয়ে পড়লেন—বন্দে মাতরম্ ধ্বনিতে আর 'বাংলার মাটি, বাংলার জল,'—'সোনার বাংলা', প্রভৃতি গানে আকাশ মুখরিত হল। 'বাঙ্গালির প্রাণ, বাঙ্গালির মন, বাঙ্গালির ঘরে যত ভাই বোন—এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান!' এই প্রার্থনা নিয়ে বাংলার যত ভাই-বোন পরস্পরের হাতে একতা ও মিলনের চিহ্ন 'রাখি' বেঁধে দিলেন। সেদিন 'অরন্ধন'—অনেকেরই উপবাস। বিকালে আপার সার্কুলার রোডে এক বিরাট জনসভায় 'অখণ্ড বঙ্গ-ভবনের'[৩৩ক] ভিত্তি স্থাপন করে, সকলে দেশের মঙ্গলসাধন ও বিদেশী পণ্য বর্জনের শপথ নিলেন। সভাপতি আনন্দমোহন বসু[৩৪] হঠাৎ গুরুতর অসুখে শয্যাগত হয়ে পড়লেন, তবুও সভায় যোগ দিবার জন্য তিনি ব্যাকুল—চেয়ারে করে তাঁকে সভায় নিয়ে আসা হল, তাঁর লিখিত ভাষণ অন্য লোকে পড়ে দিলেন। পাশে ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ে মেয়েদের জন্য জায়গা হয়েছিল, সেখানে ঘরে, বারান্দায়, ছাতে, প্রাঙ্গণে, তিল-ধারণের স্থান রইল না—শিক্ষিতা অশিক্ষিতা, আধুনিকা, অন্তঃপুরিকা, সব শ্রেণীর নারীদের সে এক অপূর্ব সমাবেশ।

তারপর আরম্ভ হল স্বদেশী আন্দোলন—মেয়েরাও এই আন্দোলনে প্রাণ ঢেলে দিলেন। আবার শোনা গেল সেই চরকার গান—'বিন্ বিন্ বিন্ বিন্ করে রে—চরকা আমার ভাতার পুত চরকা আমার নাতি, চরকার দৌলতে আমার দুয়ারে বাঁধা হাতি।' ঘরে ঘরে কত মেয়ে চরকায় সুতা কাটলেন, সেই সুতায় কাপড় বুনিয়ে নিজেরা পরলেন ও প্রিয়জনদের

পরালেন। বিলাতি মিহি সুতার কাপড় ছেড়ে তাঁরা 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে' নিলেন, সমস্ত শৌখিন বিদেশী জিনিসের বদলে দেশী মোটা জিনিস ব্যবহার আরম্ভ করলেন—মেয়েরা অনেকে নিজের হাতে কাপড় বুনে ও নানা শিল্পদ্রব্য তৈয়ারী করে বিক্রী করলেন, সেই লাভের টাকা কোন দেশহিতকর কাজে দিলেন। একজন জমিদার গৃহিণীর কথা জানি, তিনি তাঁদের পূর্ববঙ্গের জমিদারী থেকে উৎকৃষ্ট ইস্পাতের ছুরি, কাঁচি, বঁটি, ঢাকাই শাড়ি ইত্যাদি আনিয়ে রীতিমত দোকান করেছিলেন। আর প্রচুর লাভ করে সমস্ত টাকা দেশের কাজে দান করেছিলেন। মেয়েদের পরিপূর্ণ সহায়তা না পেলে স্বদেশী আন্দোলন এমনভাবে সফল হতে পারতো না।

পরের বৎসর (১৯০৬ খৃষ্টাব্দ) কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হল। এই উপলক্ষে বরোদার মহারাণীর নেতৃত্বে নিখিল ভারত নারী সম্মেলন আহ্বান করা হয়। বেথুন কলেজে এই সম্মেলন হয়, আমরা ভলান্টিয়ার ছিলাম। সারা ভারতের সমস্ত প্রদেশ থেকে সকল জাতির নারী একত্র হয়েছেন—বিচিত্র তাঁদের বেশ, বিভিন্ন তাঁদের ভাষা, কিন্তু সকলেই তাঁরা ভারতনারী—দেখে মনে কেমন একটা আনন্দ আর গর্ব বোধ হল। কিন্তু ঐ বিভিন্ন ভাষা নিয়েই আমাদের বিপদে পড়তে হল—যাঁরা ইংরাজি জানেন তাঁদের নিয়ে তো কোনই অসুবিধা হল না, যাঁরা হিন্দী জানেন তাঁদের সঙ্গেও আমরা ভাঙা ভাঙা হিন্দীতেই কোন-মতে কাজ চালিয়ে নিলাম, আবার অনেকে বিশেষ করে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতীয় মেয়েরা, না বোঝেন হিন্দী না বোঝেন ইংরাজি—শুধু মুখের দিকে চেয়ে হাসেন আর মাথা নাড়েন, আমরাও মাথা নাড়ি আর হাসি! অতিকষ্টে, মুখ-হাত-পা নেড়ে ইসারায় তাঁদের সঙ্গে বোঝাপড়া হল।

কংগ্রেসের শিল্প প্রদর্শনীও সেবারে অতি সুন্দর হয়েছিল, বিদেশী পণ্য বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে দেশী শিল্পের কেমন দ্রুত উন্নতি হচ্ছে, লক্ষ্য করে সকলেরই আনন্দ হল। আরেকটি লক্ষ্য করার বিষয় হল, মেয়েদের উৎসাহ আর আগ্রহ—মহিলাদিবস ছাড়া অন্যান্য দিনেও অসংখ্য মেয়ের ভীড়, তাঁদের সেই ঘোমটা-ঢাকা 'লাজে-ভয়ে জড়-সড়' ভাব আর নাই, অর্ধ-অবগুণ্ঠনে সপ্রতিভভাবে তাঁরা ঘুরে ঘুরে সব দেখছেন। দেখে বোঝা গেল যে, ঘোমটা আর পর্দা ঘুচে যেতে আর বেশী দেরী নাই।

মেয়েদের বেশভূষার মধ্যেও এবার রুচির পরিবর্তন দেখা গেল—আমাদের আধুনিক পোশাকের অনেকখানি বিলাতির অনুকরণে হয়েছিল, কারণ আগে বাংলাদেশে মেয়েদের 'পোশাক' বলতে একখানা শাড়িই শুধু ছিল। বিলাতি ফ্যাশনেই আমাদের জামা-জুতো সবই হয়েছিল, ভারি ভারি দেশী গহনার বদলে হাল্কা বিলাতি ধরনের গহনাই ফ্যাশন হয়েছিল, সুন্দর সুন্দর নানারঙের বিলাতি সিল্ক সিফ্‌ন লেসের শাড়ি জামারই আদর ছিল। জাতীয়তাবোধ প্রাণে জাগার সঙ্গে সঙ্গে আবার দেশী ফ্যাশানের আদর হল—ঠাকুমা দিদিমাদের যে সব গহনা কাপড় আধুনিকারা 'সেকেলে' বলে ব্যবহার করতেন না—স্মৃতিচিহ্ন বলেই যত্ন করে তুলে রেখেছিলেন, আবার সেগুলি তাঁদের অঙ্গে উঠল। আমাদের যে সব খৃষ্টান বান্ধবীদের গাউন পরবার জন্য আমরা ঠাট্টা করতাম, তাঁদের মধ্যে অনেকেই এবার গাউন ছেড়ে শাড়ি ধরলেন।

দেশের নারী-সমাজের দুঃখ-দুর্গতি দূর করে, তাঁদের মধ্যে নূতন আশা ও নবপ্রাণের সঞ্চার করাতে তাঁদের শিক্ষিতা ভগ্নীদের দানও কিছু কম ছিল না—শিক্ষিতা মেয়েদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষাদানের কাজ নিয়ে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারে সাহায্য করেছেন, বিধবা বা নিরাশ্রয়া দুঃস্থা মেয়েদের নানা শিল্পকাজ শিখিয়ে তাঁদের স্বাবলম্বিনী করবার জন্য শিল্পাশ্রম তাঁরাই স্থাপিকা এবং পরিচালনা করেছেন ; যাঁরা ডাক্তার হয়েছিলেন তাঁরা শত শত শিশু ও নারীর স্বাস্থ্য এবং প্রাণরক্ষা করেছেন ; আইন-বিদ্যা শিখে কয়েকজন মহিলা অনেক অসহায়া নারীকে আইনের সাহায্য দিয়েছেন। কত অশিক্ষিতা পর্দানশীন নারীদের অর্থ ও সম্পত্তি দুষ্ট লোকে ঠকিয়ে নেয়, তাঁদের বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা ও তত্ত্বাবধানের পরামর্শ দিবার কাজে প্রথম মহিলা ব্যারিস্টার কর্নেলিয়া সোরাবজীকে গভর্নমেন্ট নিযুক্ত করেন। মিস্ সোরাবজীকে একবার আমাদের কলেজে দেখেছিলাম, কয়েক বৎসর পরে হঠাৎ আবার দেখা হল—টাউন হলে একটা খাদ্য প্রদর্শনীতে। হাজার রকম খাদ্য সম্ভারের মধ্যে, এক-ধারে সাজানো রয়েছে নানারকমের পিঠা, লাড্ডু ইত্যাদি। মিস্ সোরাবজী বিচারক কমিটি সঙ্গে নিয়ে সেখানে এলেন—বিচারকের মধ্যে দুজন ইংরাজ মহিলা, দুজন বাঙালি—তাঁদের দেখেই বোঝা যায় যে, পিঠা-পুলির সঙ্গে তাঁদের কোনদিন পরিচয় হয়নি! আমি আমার ভ্রাতৃবধূর সঙ্গে সেখানে ছিলাম। মিস্ সোরাবজী অনুরোধ করলেন, 'এ সেক্সানটা যদি আপনারা দেখে দেন, তো বড় উপকার হয়।' আমরা ননদ-ভাজে নিরিবিলি এক কোণে বসে খাবারগুলি চেখে দেখছি, দরজায় দুজন ভলান্টিয়ার পাহারা দিচ্ছে, হঠাৎ তাদের ঠেলে হুড়মুড় করে একদল কালো গাউন পরা ভদ্রলোক ঢুকে পড়লেন, এবং সামনে খাবার দেখেই আমাদের মৃদু অনুরোধ ও ভলান্টিয়ারদের উচ্চ প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে 'খাসা!' 'বেড়ে'! 'এক্সেলেন্ট' ইত্যাদি মন্তব্যের সঙ্গে সেগুলিকে উদরসাৎ করতে আরম্ভ করলেন। আমরা নিরুপায় হয়ে চেয়ে দেখছি, এমন সময়ে বীরাঙ্গনার মূর্তিতে প্রবেশ করলেন কর্নেলিয়া সোরাবজী—'কেন আপনারা খাবার খাচ্ছেন? এসব তো আপনাদের জন্য নয়। প্লীজ, ডু গেট আউট!' বলতে বলতে দুই হাতে ঠেলে দু-মিনিটের মধ্যে সেই মিষ্টান্নলোভী উকিলের ভীড় সাফ্ করে দিলেন! বেশ বুঝলাম যে, এমনি বলিষ্ঠ তৎপরতার সঙ্গেই তিনি অর্থলোভী ধূর্ত লোকদের হাত থেকে তাঁর অসহায়া ভগ্নীদের সম্পত্তি রক্ষা করেন।

জাতীয় আন্দোলনের প্রায় গোড়া থেকেই, বঙ্গনারীর নাম তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল—১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়, তার চার বৎসর পরে, সর্বপ্রথম ভারতীয় মহিলারা তাতে যোগ দেন। এঁদের মধ্যে দু'জন বাংলার মেয়ে ছিলেন—স্বর্ণকুমারী দেবী** আর কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। এঁরা দুজনেই বরাবর কংগ্রেসের কাজ ও নানারকম নারী কল্যাণের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময়েও কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় পরোক্ষভাবে কাজ করছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা দেবী এ আন্দোলনে একজন নেত্রী ছিলেন। তাঁর রচিত অনেক দেশপ্রেমের গান কংগ্রেসে এবং বড় বড় সভায় গাওয়া হত। দেশের শিক্ষিত মেয়েরা, শিক্ষা ও স্বাধীনতা লাভ করে শুধুই নিজেদের ও নিজ পরিবারের সুখ ও উন্নতিতে সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি—তাঁদের মধ্যে অনেকেই এমনি নানাভাবে নিজেদের সৌভাগ্যের ফল, সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত সমস্ত

নারীসমাজের মধ্যে বিতরণ করতে চেয়েছিলেন। তাঁদের চেষ্টা ও আশা বিফল হয়নি।

অনেক বাধা অতিক্রম করে, অনেক নিন্দা ও প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে যে নারী প্রগতির ক্ষীণ ধারা বয়ে চলেছিল, ক্রমেই সে ধারা পুষ্টিলাভ করছিল—বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই তার মধ্যে যেন জোয়ার এসে গেল!

সবচেয়ে বড় কথা, দেশের মেয়েরা আত্মসচেতন হয়ে উঠলেন—তাঁরাও যে দেশমাতার সন্তান, দেশসেবার অধিকার এবং দায়িত্ব যে তাঁদেরও আছে, এই কথা উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে সে দায়িত্ব বহনের যোগ্যতা লাভ করবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা অনেকের মনেই জেগে উঠল।

বাংলার মেয়েদের এই নব-জাগরণের উৎসাহের মধ্যেই একদিন আমার ছাত্রীজীবন শেষ হল। বিবাহের পরে বাংলা দেশ ছেড়ে বিহার প্রদেশ চলে গেলাম।

রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬ জুলাই, ১৯৬৪

প্রবাসে

বিহার প্রদেশটি তখন নূতন তৈয়ারী হয়েছে। প্রায় ছয় বৎসরব্যাপী সংগ্রাম ও আন্দোলনের ফলে বাংলার বিযুক্ত অংশটি আবার সংযুক্ত হল। সরকার বাহাদুর ধড়ে মুণ্ডে জুড়ে দিলেন বটে, ওদিকে কিন্তু হাত-পা কেটে দিলেন। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর মিলে যে এক বিরাট 'বঙ্গপ্রদেশ' ছিল তা থেকে 'বাংলা' এবং 'বিহার ও উড়িষ্যা' নামে দুইটি পৃথক প্রদেশ করলেন ; ছোটনাগপুরও বিহারের অন্তর্ভুক্ত হল (কয়েক বৎসর পরে উড়িষ্যা বিহার থেকে পৃথক হয়েছিল)। এই নূতন বিহার প্রদেশের অস্থায়ী রাজধানী নির্বাচিত হল, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যে ভরা রাঁচি শহরটি। আমার শ্বশুর মহাশয় বৃদ্ধ বয়সে পেন্সন নিয়ে রাঁচিতে বাস করছিলেন, সুতরাং তখন আমরা বিহার-প্রবাসী হয়ে গেলাম।

রাজধানীর মর্যাদা লাভের সঙ্গে সঙ্গে ছোট শহরটির শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ হল। আগে থেকেই এখানে অনেক বাঙালীর বাস ছিল, ক্রমে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর[৩৬] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর[৩৭], প্রমথনাথ বসু[৩৮] প্রভৃতি অনেকে রাঁচিতে বাড়ি করলেন, তার ফলে এখানে বেশ সুন্দর একটা সামাজিক পরিবেশের সৃষ্টি হল।

রাঁচি থেকে বদলি হয়ে, একে একে ছোটনাগপুর ও বিহারের প্রায় সমস্ত জেলায় ঘুরে বেড়ালাম। ছোটনাগপুরের অনেক অংশই ছিল বাঙালী প্রধান—সেখানকার শিক্ষিত সমাজের প্রায় সমস্তই তখন বাঙালী। অনেক শিক্ষিত উদার-মনা লোক, স্বাস্থ্যলাভের জন্য কিংবা বৃদ্ধ বয়সে নিরিবিলি শান্তিতে দিন কাটাবার আশায় রাঁচি হাজারিবাগ গিরিডি প্রভৃতি জায়গায় বাড়ি করেছিলেন। তা ছাড়া এইসব সুন্দর স্বাস্থ্যকর স্থানে প্রতি বৎসর নানাদিক থেকে অনেক লোক বায়ু-পরিবর্তনের জন্য আসেন ; বৎসরের মধ্যে কয়েকটি মাস এই ছোট শহরগুলিকে সজীব ও আনন্দমুখর করে তোলেন এই নবাগতের দল। বিশেষ করে তাঁদের মেয়েরা শহরের বদ্ধ বাতাস ও সংসারের বাঁধা নিয়মশৃঙ্খল থেকে এই ক্ষণিক মুক্তির আনন্দটুকু প্রাণভরে উপভোগ করে শরীর মন তাজা করে নিয়ে যান—সে আনন্দ ও সজীবতার স্পর্শ এখানকার মেয়েদের প্রাণেও কিছু দিয়ে যান। তাই বুঝি এইসব জায়গার প্রাকৃতিক আবহাওয়ার মত এখানকার সামাজিক আবহাওয়াও অনেকটা মুক্ত ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। পর্দার কড়াকড়ি এসব জায়গায় ছিল না ; সামান্য সম্বল নিয়ে আরম্ভকরা বালিকা বিদ্যালয়গুলির দিন দিন উন্নতি হচ্ছিল ; প্রায় সব জায়গাতেই দুচারজন শিক্ষিকা মিলে কেন্দ্র করে সেখানকার উৎসাহী মেয়েরা ছোট ছোট মহিলা সমিতি গড়ে তুলেছিলেন। এইসব জায়গার অনেক আনন্দময় স্মৃতিতে আজও আমার মন ভরে আছে।

আবার কোনো কোনো জায়গায়, বিশেষ করে বিহার অঞ্চলে গিয়ে অবস্থাটা একেবারে অন্যরকম দেখতাম। সেখানকার মেয়েরা যেন তাঁদের ঠাকুরমা-দিদিমাদের যুগেই থেমে রয়েছেন। পর্দার বাঁধন ছেঁড়া, কলেজে পড়া, তার উপরে ব্রাহ্ম মেয়ে, তাঁদের কাছে ছিল এক আজব জিনিস।

প্রথম যখন এই রকম একটা শহরে গেলাম, দুএক দিনের মধ্যেই আমারই সমবয়সী একটি বউ দেখা করতে এল। তার স্বামীও সম্প্রতি সেখানে বদলি হয়ে এসেছেন। মেয়েটি

দুঃখ করল যে, এখানকার মেয়েরা তার সঙ্গে মিশতে চায় না—সে ঘোমটা দেয় না, সর্বদা জামা গায়ে দেয়, তাই ভারি নিন্দা করে। আমিও একদিন তার বাড়িতে গেলাম। যাওয়া-আসার পথে, দু'ধারের বাড়িগুলোর মধ্যে বেশ একটু চাঞ্চল্য অনুভব করলাম—দ্রুতপায়ে ছুটে আসার দুপ্‌দুপানি, খড়খড়ির ফাঁকে অনেক জোড়া কৌতূহলী চোখের চাহনি, আর চাপাগলার ফিস্‌ফিসানি। আমি চলে আসার পরে পাড়ার এক মাতব্বর-গৃহিণী বউটিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে এসেছিল গা?' পরিচয় পেয়ে মন্তব্য করলেন—'তা, ম্যামএর সাথে ম্যামই মেশে!'

এরপরে এলেন এক বৈষ্ণবী ঠাকরুণ। তিনি নাকি পাড়ার মেয়েদের লেখাপড়া শেখান আর গৃহিণীদের পদাবলী গান শোনান। বসে কিছু 'সদালাপ' হচ্ছে, এমন সময়ে আয়ার কোলে আমার শিশুকন্যাটি সেখানে এল। বৈষ্ণবী ঠাকরুণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইটি বুঝি আপনার সোন্তান?' বললাম, 'হ্যাঁ', 'এসো খোকাবাবু, আমার কোলে এসো' বলে দুই হাত বাড়াতেই, আয়া জানালো—'খোকাবাবু লয়, খুকু বটে'—অমনি হাতদুটি গুটিয়ে, নিস্পৃহ কণ্ঠে বললেন, 'ও, বিটিছেল্যা? আমি বলি কি, সোন্তা-ন্!' প্রশ্ন করলাম, 'মেয়েও কি সন্তান নয়?' তখন একটু অপ্রস্তুত হয়ে, তাড়াতাড়ি দুয়েকটি নারীমহিমাব্যঞ্জক শ্লোক আওড়ালেন।

এবার একে একে গৃহিণীরা আসতে আরম্ভ করলেন। কেউ এলেন একটু ভয়ে ভয়ে সঙ্কুচিতভাবে—'কদিন ধরেই ছেলে বলছিল, "যাও না মা, আলাপ করে এসো", তা আমি বলি কি, তাঁরা কি আর আমাদের মতন মানুষের সাথে কথা কইবেন বাবা?' কেউ বা এলেন বেশ একটু সন্দিগ্ধ ভাবে, যেন সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে। কথা বলার ফাঁকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখে নিলেন, অতি ভদ্র শিষ্ট এবং মিষ্ট আলাপের মধ্যে দিয়ে কৌশলে নাড়ী-নক্ষত্র সব জেনে নেবার চেষ্টা করলেন। কেউ বা আবার অতশত এটিকেট ও ভব্যতার ধার ধারেন না—সোজাসুজি কথা বললেন। কিন্তু এমন শিশুর মত সরল কৌতূহলের সঙ্গে প্রশ্ন করেন যে, কিছু মনে করবারও উপায় থাকে না—বরং বেশ মজা লাগে। 'কটা পাস দিয়েছো, মা?' 'বয়স কত হলো?' 'কদ্দিন বে হয়েছে?' 'বাপ কি করেন?' ইত্যাদির পরে পরম আগ্রহ ও চরম কৌতূহলের সঙ্গে, প্রায় ফিস্‌ফিস করে—'হ্যাঁ মা, তা—বে-টা কি নিজেরা পছন্দ করে হল, না বাপ্-মায়ে ঠিক করলেন? কত টাকা লাগল?' নিজেদের পছন্দের সঙ্গে বাবা-মায়ের ইচ্ছার মণিকাঞ্চন যোগ হয়েছিল—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাই হয়ে থাকে এবং আমাদের মেয়ের বিয়েতে পণ লাগে না—বাবা-মা নিজেদের সাধ এবং সাধ্য অনুসারে মেয়ে-জামাইকে উপহার দিয়ে থাকেন, শুনে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করলেন—সেই সঙ্গে নিজেদের 'পোড়া-কপালের মুখে মুড়ো-ঝাঁটার বাড়ি' মারবার ইচ্ছা প্রকাশ করতেও ছাড়লেন না।

প্রায় সব জায়গাতেই ঐ একই ধরনের ব্যাপার হত। গৃহিণীদের সন্দেহ ও ভয় ভঞ্জন হলে পরে, তাঁরা দলে-দলে বৌ-ঝিদের নিয়ে আসতেন। তরুণীদের সঙ্গে ভাব হয়ে যেতে দেরী হত না। নিজেদের বৈচিত্র্যহীন, বাঁধনঘেরা বধূজীবনের মধ্যে একটু নূতন ধরনের কিছু দেখবার জন্য তারা উৎসুক হয়েই থাকত। শাশুড়ীরাও অনেকে বলতেন, 'ঘরে বসে তো শুধু তাস পিটবে আর ঘুমুবে, তার চেয়ে ও-বাড়িতে গেলে, দুটো ভাল কথা শুনবে—

সেলাই-ফোঁড়াই, ঘরকন্নার কাজ ও নূতন রকম কিছু শিখে নিতে পারবে।' বিবাহযোগ্যা মেয়ের মা'দের খুব আগ্রহ ছিল যে, আমি যতরকম সেলাই জানি সবই একটু একটু নমুনা মেয়েকে শিখিয়ে দিই। তা হলে, কনে দেখাবার সময় বরপক্ষের সামনে সেগুলি মেলে ধরে মেয়ের গুণপনার পরিচয় দিতে পারবেন।

শাশুড়ীরা যেদিন সঙ্গে থাকতেন না, সেদিন বধূরা বেশ প্রাণ খুলে নিজেদের সুখদুঃখের কথা বলত। একটু আধটু লেখাপড়া প্রায় সকলেই শিখেছিল, অনেকে স্কুলেও পড়ছিল, কারো বা গানের গলা চমৎকার ছিল—অনেক কিছু শিখবার ও জানবার আকাঙ্ক্ষা তাদের মনে ছিল, কিন্তু দশ বছর হতে না হতেই সেসব ঘুচিয়ে মাথায় ঘোমটা দিয়ে বেচারীদের শ্বশুরবাড়িতে আসতে হয়েছে। এখানে তাদের গান-বাজনা বা লেখা-পড়ার চর্চা করা নিন্দার কথা—ঘরের বউ শুধু ঘরকন্নার কাজই করবে, এই এখানকার নিয়ম। তাও কি নিজের ইচ্ছা বা পছন্দমত একটু কিছু করবার জো আছে? সমস্ত কাজই বড়দের নির্দেশে কলের মত করে যেতে হয়। আমার কাছে 'সেলাই ফোঁড়াই' ইত্যাদি কাজ শেখার সঙ্গে, হাসি-গল্প-গানে তাদের আসর বেশ জমে উঠত। এদের নিয়ে কিন্তু সমিতি ইত্যাদি স্থায়ী কোন জিনিস গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না, কারণ গৃহিণীদের মতে 'মেয়েদের আবার সভা-সমিতি কি? ওসব বাবুদেরই পোষায়!'

বাবুদের কিন্তু সব জায়গাতেই 'ক্লাব' ছিল। যেখানে কয়েকঘর বাঙালীর বাস, সেখানেই তাঁদের আর কিছু না থাকলেও অন্তত ছোট হোক বড় হোক একটি করে ক্লাব ও লাইব্রেরি থাকবেই—সেই সঙ্গে অনেক জায়গাতেই 'ড্রামাটিক ক্লাব'ও থাকত। এইসব ছোট ছোট মফস্বল শহরে বাইরে থেকে সার্কাস, থিয়েটার ইত্যাদি তো বড় একটা আসত না। কিন্তু বৎসরে দু তিনবার ড্রামাটিক ক্লাবের অভিনয় নিয়মিতভাবে হত। মেয়েদের কাছে সেগুলি ছিল এক উৎসবের ব্যাপার। শহরসুদ্ধ বাঙালী, বিহারী, মারোয়াড়ী সমস্ত মেয়েরা, সন্ধ্যার মধ্যে সংসারের পাট সেরে, ঝিয়ের কোলে কচি ছেলে ও দুধের বাটি-ঝিনুক দিয়ে, পানের বাটা ও দোক্তার কৌটো হাতে নিয়ে, সারারাত্রির মত নিশ্চিন্ত হয়ে নাটক দেখবার জন্য বেশ গুছিয়ে বসতেন। বাংলা নাটক সকলে বুঝুক না বুঝুক, চিকের অন্তরালে মেয়ে-মজ্‌লিস্ এমনি জমে উঠত যে, মাঝে মাঝে বাইরে বাবুদের কাছ থেকে প্রচণ্ড ধমক আসত—'চ্-প্! চু-প্!! আ-স্তে!!'

পর্দা দিয়ে ঘিরে আর ঘোমটা দিয়ে ঢেকেই তো তরুণ প্রাণের স্বাভাবিক স্ফূর্তিকে সমস্তক্ষণ দাবিয়ে রাখা যায় না! ঘেরাটোপ্ ঢাকা খাঁচার মধ্যে পোষাপাখির কলগীতের মতই, পর্দার মধ্যে ঘোমটা ঢাকা মেয়েদের আনন্দ কলরব মাঝে মাঝে নিষেধের শাসন ছাপিয়ে উঠত; কখনও বা একটু ফাঁক পেলে হঠাৎ তারা কিছু একটা 'দুঃসাহসের কাজ' করে বসত।

এই রকম একটি ছোট্ট শহরে, বাঙালীটোলার পাশেই একটা পুকুর ছিল, ভারি মিষ্ট তার জল। শুধু পাড়ার মেয়েরা নয়, দূর থেকেও কলসী কাঁখে গৃহস্থবধূরা এসে খাবার জন্য সেই জল নিয়ে যেত। একই পুকুরে স্নান, কাপড় কাচা, বাসন মাজা, সবই হত। সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের দৃষ্টি পড়ল এই পুকুরটির উপরে। মাটির সঙ্গে সমতল বড় একটা

পাথরের ফাটলের মধ্যে থেকে নির্মল জলধারা বেরিয়ে এসে পুকুর সৃষ্টি করেছিল। সাহেব সেই পাথরটি ঘিরে মস্ত সিমেন্টের চৌবাচ্চা করিয়ে, চারদিকে পাকা দেয়াল দিয়ে, উপরে ছাত তুলে দিলেন। দেয়ালের গায়ে পাইপ বসিয়ে তাতে তিন চারটে কলের মুখ লাগিয়ে দিলেন—যাতে তার নীচে কলসী পেতে অনায়াসে জল ভরা যায়। তারপর ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে নোটিস দিয়ে দিলেন যে, সকলেই যেন ঐ কল থেকে খাবার জল নেয়, পুকুরের জল অন্য কাজে ব্যবহার করে।

বিশুদ্ধ পানীয় জলের চমৎকার সুব্যবস্থা করে দিয়ে সাহেব তো মনে মনে বেশ আত্মপ্রসাদ অনুভব করলেন। পাড়ার মেয়েদের মনে কিন্তু তার চেয়েও চমৎকার একটি মতলব খেলে গেল—'পুকুরে স্নান করার অনেক অসুবিধা, বাঁধানো ঘাট নেই, চারদিক খোলা, রাস্তা থেকে দেখা যায় ; তাই ভোর না হতেই, অন্ধকার থাকতে থাকতে স্নান সেরে নিতে হয় ; তার চেয়ে এই সুন্দর সৌখিন "স্নানাগার"টির সদ্ব্যবহার করা যাক না ?' একদিন নির্জন দুপুরে, একদল তরুণী (সঙ্গে একটি বয়স্কা গৃহিণীও ছিলেন) চুপিচুপি জানালা বেয়ে উঠে, সেই চৌবাচ্চার জলে ঝাঁপ দিল ; তারপর তাদের স্ফূর্তি দেখে কে!

মৃণাল ভুজের ললিত বিলাসে
চঞ্চল জল নাচে উল্লাসে
আলাপে-প্রলাপে হাসি উচ্ছ্বাসে
আকাশ উঠিল আকুলি।[৩৯]

ঠিক সেই সময়ে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব একটি সর্‌জমিন্ তদন্ত সেরে সেই পথে ফিরছিলেন। এই জলের কলটি তাঁর ভারি শখ ও গর্বের জিনিস। ভাবলেন, একবার দেখে যাই! ঘোড়া থেকে নেমে, কাছে যেতে না যেতেই সাহেব থমকিয়ে দাঁড়ালেন—জানালাটা ভিতর থেকে বন্ধ, কিছুই দেখা যায় না, কিন্তু বাহির থেকে কলরব শুনেই ব্যাপারটা বুঝতে কিছু বাকি রইল না। পা-টিপে টিপে এসে তিনি জানালার বাহির দিকের শিকলটা তুলে দিয়ে বাড়ি চলে গেলেন। ঘন্টাখানেক পরে, আবার তেমনি চুপি চুপি শিকল খুলে দিয়ে গেলেন। সেদিন থেকে সেই জানালায় সরকারী তালা পড়ল। তবে, তালার কোনো দরকার ছিল না—এক ঘন্টা বন্ধ থেকেই বেচারীদের স্নানের সাধটি ঘুচে গিয়েছিল।

বিহারে দারুণ জলপ্লাবন প্রায়ই হয়। একবার কোনও শহরের মেয়েদের মধ্যে থেকে বন্যার জন্য কিছু চাঁদা তুলবার ইচ্ছা হল। সেখানকার বাসিন্দা একজন মহিলা বললেন, 'শুধু হাতে চাঁদা চাইলে কেউ কিচ্ছু দেবে না ; তবে যদি কোন তামাসার ব্যবস্থা করতে পারেন, তাহলে দেখবেন বেশ টাকা উঠবে।' একটি বিধবা মহিলা নিজের বাড়িতে পাড়ার ছোট ছোট মেয়েদের জন্য ছোট্ট একটি স্কুল করেছিলেন। সেখান থেকে কয়েকটি মেয়ে আর আমার মেয়েদের[৪০] নিয়ে কিছু অভিনয় শেখানো হল। পাড়ার মধ্যেই বাঙালী ক্লাব ছিল, তার সেক্রেটারীর স্ত্রী বললেন, 'ওনাদের ক্লাবঘরটি বেশ বড়, আর পাকা স্টেজও রয়েছে—সেখানে করলে, বেশ সুবিধা হবে।' অমনি এক জাঁদরেল গৃহিণী চোখদুটি কপালে তুলে গালে হাত দিয়ে বললেন, 'সে কি গো! বাবুদের কেলাবে মেয়েরা নাটক করবে নাকি!'

অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা হল যে, বাবুরা তো আর তখন সেখানে থাকবেন না, সেদিন ওঁরা ক্লাবের বাড়িটি আমাদের ছেড়ে দেবেন। কিন্তু কে বোঝে সে-কথা? কয়েকজন গৃহিণী একজোটে জোর আপত্তি তুললেন। রাসসুন্দরী দেবীর জীবনকথাতে পড়েছিলাম যে, তাঁর স্বামীর ঘোড়াটি চর্‌তে চর্‌তে মাঝে মাঝে বাড়ির ভিতরের আঙ্গিনায় চলে আসত, অমনি তিনি ঘোড়াকে দেখেই একগলা ঘোমটা টেনে দিতেন—সে যে 'কর্তার ঘোড়া'।[৪১]

যাক্, আমাদের উদ্দেশ্য ছিল টাকা তোলা, কাজেই যাতে সব মেয়েরা আসতে পারেন, সেইভাবে, এক বাড়ির পাঁচিলঘেরা আঙ্গিনায় ভালরকম পর্দার ব্যবস্থা করে অভিনয় করা হল। শহরের বাঙালী বিহারী অনেক মেয়েরা এসে আমাদের আয়োজনটিকে আশাতীতভাবে সফল করে তুললেন। সেই জাঁদরেল গৃহিণীটি সদলবলে এসে সামনের সারিতে জাঁকিয়ে বসলেন, ঘন ঘন করতালি ও বাহবা দিয়ে ছোট্ট অভিনেত্রীদের উৎসাহ দিলেন এবং 'কেত্তোনটা আবার হোক' বলে চেঁচিয়ে 'হরি বল মন' গানটি তিনবার শুনলেন।

বাহিরে কর্তাদের প্রতাপ যতই হোক্, বাড়ির ভিতরে এইসব গৃহিণীই ছিলেন 'প্রভূত-প্রতাপ-শালিনী'। স্বামীপুত্রের পদমর্যাদার জোরে, কিংবা নিজেদের ব্যক্তিত্বের জোরেই একেকজন শুধু নিজেদের পরিবারের নয়, সমস্ত পাড়ার মেয়েদের উপরে কর্তৃত্ব করতেন। ক্রিয়াকর্মে সব 'যজ্ঞিবাড়ি'তে গিয়ে কোমর বেঁধে খবরদারি করতেন। রোগে শোকে বিপদে সকলের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন। দীর্ঘকাল প্রবাসে থেকেও বাংলার নারীর বৈশিষ্ট্য এঁরা অনেক পরিমাণে বজায় রেখেছিলেন, কতগুলি সুন্দর প্রাচীন সামাজিক প্রথাকেও এঁরাই বাঁচিয়ে রেখেছিলেন।

অন্যদিকে আবার অনেক কুসংস্কার ও কুপ্রথার জীর্ণ জঞ্জাল আঁকড়িয়ে থেকে, এঁরাই নারীসমাজের উন্নতির পথে বাধার সৃষ্টি করছিলেন। অনেক গুণ এঁদের ছিল, কিন্তু অন্ধ-সংস্কার যে কিভাবে মানুষের সহজ বিচার-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রাখে, প্রাণের স্বাভাবিক দয়ামায়া সহানুভূতিকে সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ করে দেয়, তার দৃষ্টান্ত এঁদের মধ্যে দেখে অনেক সময় মনে দুঃখ হত।

পাড়ার একটি মেয়ের হঠাৎ খুব অসুখ হয়েছে শুনে দেখতে গেলাম। রোগীর অবস্থা খারাপ, ঘন ঘন ফিট্ হচ্ছে, খবর পেয়ে প্রতিবেশিনীরা অনেকে এসেছেন, ডাক্তাররা ইন্‌জেকশন ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত, এর মধ্যে হঠাৎ মেয়ের মা কোথা থেকে একটা বঁটি পুড়িয়ে এনে মেয়ের কপালে চেপে ধরলেন। অন্যরা তাঁর হাত ধরতে ধরতে মেয়ের কপালটা পুড়ে প্রকাণ্ড ফোস্কা পড়ে গেল। মেয়ের উপরে প্রেতিনী ভর করেছে মনে করে তিনি 'আঁশবঁটির ছেঁকা' দিয়ে পেত্নীকে তাড়াচ্ছিলেন!

এক ভদ্রলোকের একটি মেয়ে ছিল। বেশ সুন্দরী, কিন্তু একেবারে জড়বুদ্ধি। প্রতিবেশিনী এক গৃহিণী আমাকে বললেন, 'দেখছেন তো বাপমায়ের আক্কেলখানা? প্রায় বিশ বছর বয়স হতে চলল, তবু মেয়েটার বিয়ে দেবার নামটি করে না।' আমি বললাম, 'কিন্তু মেয়েটির তো শুনেছি একেবারে বুদ্ধি নাই—নিজে খেতে পরতে পারে না, ভাল করে কথা বলতে বা বুঝতেও পারে না—ওর বিয়ে কি করে হবে?' 'তা কেন হবে না? অমন সুন্দর মেয়ে, বাপের অত পয়সা, কোনো ভাল বংশের গরিব ছেলেকে মোটা টাকা ধরে

দিলেই অমনি রাজি হয়ে যেতো—তারপরে সে ছেলের ইচ্ছে হয়তো আরো দশটা বিয়ে করুক না গিয়ে, ওদের মেয়ে ওদেরই থাকতো।'

'অমন বিয়ে দিয়ে কী লাভ হত?'

'আর কিছু না হোক, জাতটা তো রক্ষে হত!'

আরেকজন ভদ্রলোক টাকার অভাবে তাঁর চৌদ্দ বছরের মেয়ের বিয়ে দিতে পারছিলেন না। 'মেয়ের মায়ের রাতে ঘুম হচ্ছে কি করে, ভাতের গরাস গলা দিয়ে নামছে কি করে', সেই ভাবনায় প্রতিবেশিনীদেরও চোখে ঘুম নাই। পাড়ার মাতব্বর গৃহিণী পরামর্শ দিলেন, 'টাকা নেই, তো ছেলেটার বিয়ে আগে দাও না—ছেলের বিয়েতে যে টাকা ঘরে আসবে তাতেই তো মেয়ের বিয়ের খরচা উঠে যাবে।' ছেলেটির বয়স সতেরো, সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে। যাহ'ক, অনেক কষ্টে মেয়েটির বিয়ে তো হল, কিন্তু দু'মাসের মধ্যেই সে বিধবা হল। কথাটা শুনেই, সেই গৃহিণীটি প্রশ্ন করলেন—'হ্যাঁ রে, তা, রেখেছে কেমন? খাচ্ছে পরছে কী? বলে, বামুনের ঘরের বিধবা!' মেয়েটা যে অতি 'অলক্ষুণে' ও 'অপয়া', সে বিষয়ে কারো মনে সন্দেহ রইল না। এমন কি, মেয়ের মা-ও মেয়ের নিজের পোড়াকপালের জন্য এবং পরিবারের যা-কিছু দুর্ভাগ্যের জন্য তাকেই দায়ী করে, নানা কটু কথা বলতে আরম্ভ করলেন।

প্রায় সব বাড়িতেই রান্নাঘরের কাজের জন্য 'জল চল্' জাতের লোক রাখা হয়, কোন কোন জায়গায় 'সদ্-জাতের' লোক সক্‌ড়ি বাসন মাজে না—সেখানে 'এঁটো কাড়বার' জন্য অন্য ঝি রাখতে হয়। একজন গৃহিণী গর্ব করে বললেন যে, তাঁর ঝিকে তিনি বারান্দায় পর্যন্ত উঠতে দেন না—সে উঠানে বাসন মেজে রোয়াকে রেখে দেয়, রান্নাঘরের চাকর একঘড়া জল ঢেলে শুদ্ধ করে, তবে সে বাসন ঘরে তোলে। একদিন সে-বাড়ির একটি শিশু উঁচু রোয়াকের উপর থেকে পড়ে যাচ্ছিল, ঝি ছুটে গিয়ে তাকে ধরে ফেলল ; গৃহিণী তাড়াতাড়ি শিশুটির জামা ছাড়িয়ে গায়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিলেন। ঝি যে শিশুকে আঘাত থেকে বাঁচালো—সেজন্য তাকে একটা মিষ্টি কথা বলা দূরে থাক্, ছেলেকে ছুঁয়ে দেওয়ার জন্য এমন অপ্রসন্নভাবে তার দিকে তাকালেন যে, বেচারা অপরাধীর মত সংকুচিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আমার ঝি-টি ছিল ভারি পরিশ্রমী ও সৎস্বভাবের মেয়ে। তাকে আমি একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে শিখিয়েছিলাম। তাই দেখে একজন গৃহিণী আমাকে সাবধান করে দিলেন—ওতে নাকি ওদের 'চরিত্তির খারাপ' হয়। আরেকজন বললেন, 'বুঝলে বৌমা, এদের কক্ষনো লাই দিতে নেই—দিলেই মাথায় চড়ে বসবে।' আমি 'বিদ্যেন্ হলেও হাজার হোক্ বয়সে ছেলেমানুষ তো, সংসারের জ্ঞান এখনও হয়নি,' তাই তাঁরা মাঝে মাঝে আমাকে এইরকম সব জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিয়ে যেতেন।

রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, ২ অগাস্ট, ১৯৬৪

অন্দরমহল

বিহারী মেয়েদের সঙ্গে মিশবার সুযোগ প্রথমে বড় একটা হয়নি, কারণ তাঁদের পর্দার কড়াকড়ি খুব বেশী ছিল। নিজেদের মধ্যেও তাঁরা মেলা-মেশা যাওয়া-আসা খুব কমই করতেন—বাঙালি মেয়েদের মত 'পাড়া বেড়ানো' তাঁদের চল্‌তো না। সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা ছিলেন যাকে বলে 'অসূর্যম্পশ্যা'! বড় বড় সাবেকি ধরনের বাড়িগুলোর বাহিরে থাম-খিলানের খুব বাহার, কিন্তু অন্দরমহলটি উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, ছোট্ট ছোট্ট জানালাগুলিও প্রায়ই বন্ধ—বাহিরের আলোবাতাসের যেন সেখানে প্রবেশ নিষেধ। বাড়ির মেয়েদের জীবনে ও বাহিরে সাজসজ্জা অলঙ্কারের অভাব ছিল না, কিন্তু অন্তরটি ছিল শত বিধিনিষেধের শাসনে ঘেরা নিজেদের ছোট্ট গণ্ডিটুকুর মধ্যে আবদ্ধ—বাহির জগতের কোন বার্তা সেখানে পৌঁছতো না। তাঁদের ঘরের বাহিরে যাওয়া—অনেকের পক্ষে বাপের বাড়িতে যাওয়াও, কালেভদ্রে হত। এক জমিদার গৃহিণী বলেছিলেন, 'সেই একদিন "দুল্‌হান্"এর সাজে পাল্কি চড়ে, এবাড়ির অন্দরে ঢুকেছি—আবার একদিন "সোহাগীন্"এর সাজে, খাটিয়ায় চড়ে, এখান থেকে বাহির হ'ব!'

দেখাদেখি কোন কোন বাঙালিও উৎকটরকম পর্দা করতে শিখেছিলেন। আমাদের পরিচিত এক ভদ্রলোকের স্ত্রী ছিলেন ঘোর পর্দানশীন্—বাড়ির চাকর বামুনদের সামনেও বেরোতেন না ; সঙ্গে মা ছিলেন, তিনিই সংসার চালাতেন। একবার সেই বউটির খুব অসুখ হল। তাঁদের বাড়িতে গিয়ে দেখি যে, বামুনঠাকুর রোগীর জন্য পথ্য তৈরী করেছে কিন্তু সেটা তাঁর কাছে কি করে পৌঁছনো যাবে, তাই নিয়ে বিষম সমস্যা বেধে গিয়েছিল। চাকর বামুনদের তো সে ঘরে প্রবেশ নিষেধ, আর গৃহিণী স্নান সেরে তাঁর নিরামিষ হেঁশেলে ঢুকেছেন। আমিষ হেঁশেলের রান্না এখন তিনি ছোঁবেন না। ঝি দুটি নীচুজাতের, আর আমার তো জাতই নাই! ওদিকে রোগী ক্ষুধায় কাতর। অনেক মাথা ঘামিয়ে সেই গ্রীষ্মকালে একটা মোটা লেপ এনে রোগীর আপাদমস্তক মুড়ে ঢেকে দিয়ে পর্দা রক্ষা করা হল, তারপর বামুনঠাকুর ঘরে ঢুকে পথ্য রেখে দিয়ে গেল।

গুজরাটের মেয়েরা পর্দা মানে না বলেই তো জানতাম, এখানে কয়েকটি গুজরাটি পরিবারের মেয়েদের পর্দা করতে দেখে অবাক হয়েছিলাম। তাঁরা বললেন, 'দেশে তো আমরা পর্দা করি না, কিন্তু এখানে পর্দা না করলে ভারি নিন্দা হয়। বিদেশে এঁদের মধ্যে বাস করছি—আপদে বিপদে এঁরাই তো ভরসা, কাজেই এঁদের তুষ্ট করে চলতে হয়।'

মুসলমান মেয়েদের তো কথাই নাই। তাঁদের পক্ষে বাড়ির বাহিরে যাওয়াটা ছিল এক মহা ঝামেলার ব্যাপার। একবার কোথাও যাবো, রেলের 'মহিলা কামরায়' উঠে বসেছি। ট্রেন ছাড়তে আর দুচার মিনিট মাত্র বাকি, এমন সময়ে হঠাৎ একটা হৈচৈ লেগে গেল। চার-পাঁচজন চাপরাশি হাঁক্‌ডাক্ করে প্ল্যাটফর্মের ভীড় সরিয়ে দিল, চার বেয়ারা হুম্‌হাম্ করে এক পর্দা-ঢাকা পাল্কি নিয়ে আমাদের কামরার সামনে থামল। পাল্কিটাকে ঠিক গাড়ির দরজার সমান উঁচু করে তুলে ধরা হল। সঙ্গে এক বুড়ি আয়া ছিল, সে তখন পর্দা সরিয়ে

তার ভিতর থেকে একজন বোরখা পরা মহিলাকে বাহির করে আনল। তাঁকে প্ল্যাটফর্মের মাটি মাড়াতে হল না, সোজা পাল্কি থেকে কাম্‌রার মধ্যে পা বাড়ালেন। আয়া তাঁকে হাত ধরে এক কোণে বসিয়ে সেদিকের জানালাটা বন্ধ করে দিল। ট্রেন ছেড়ে স্টেশন পার হয়ে গেলে পরে, আস্তে আস্তে বোরখাটি খুলে দিল।

মহিলাটি ওড়্‌নার ঘোমটা ফাঁক করে সামনের সীটে আমাকে দেখতে পেয়েই, ভারি আগ্রহের সঙ্গে আলাপ সুরু করলেন। কথায় কথায় জানলাম যে, তিনি আমারই প্রতিবেশিনী—এক বৎসর প্রায় পাশাপাশি রয়েছি, অথচ এতদিন তাঁর অস্তিত্বই বুঝতে পারিনি! দুঃখ করলেন যে, তাঁর বাড়ির বাহিরে কোথাও যাবার হুকুম নাই। অনেক কষ্টে বহুদিন পরে এবার একমাত্র ভাইয়ের বিয়েতে বাপের বাড়ি যাবার অনুমতি পেয়েছেন—ভাই নিজে এসে নিয়ে যাচ্ছে। পথে এক স্টেশনে আবার তেমনি সমারোহের সঙ্গে তিনি নেমে গেলেন।

আমার বাড়িতে যাঁরা আসতেন, তাঁদেরও অনেক তোড়জোড় করে আসতে হত। আসতেন তাঁরা রাত্রে। আগে থেকে খবর পাঠাতেন, যাতে আমি বাড়ির কর্তা থেকে ভৃত্য পর্যন্ত সমস্ত মরদ্‌দের সরিয়ে ফেলতে পারি। তাঁদের মোটরের জানালা দরজায় কাঁচের ভিতরে রেশমী পর্দা লাগানো থাকতো। সামনের সীট্ আর পিছনের সীটের মাঝখানেও পর্দা ঝুলতো। যাতে ড্রাইভার তাঁদের দেখতে না পায়। তাঁরা গাড়িতে উঠে পর্দা করে বসলে পরে ড্রাইভার এসে উঠতো এবং পৌঁছিয়েই সে নেমে দূরে সরে যেতো—তারপর তাঁরা নামতেন। তাঁদের বাড়িতে গেলেও ঐ রকম অস্বস্তিকর পর্দার শাসনে প্রাণ হাঁফিয়ে উঠতো। পাঁচছয় বৎসর পর্যন্ত তাঁদের শিশুকন্যারা বাহিরে হেসেখেলে বেড়াতো, তারপরে তারাও পর্দার বেড়াজালে ধরা পড়তো। বিহার প্রবাসী একটি বাঙালি মুসলমান মেয়ে আমাকে বলেছিলেন, 'এদেশে বিয়ে হয়েই আমার এমন পর্দার বাড়াবাড়ি হয়েছে—কলকাতায় আমার মা বোনেরা কিন্তু এতটা করে না।'

এঁদের মধ্যে অনেকেই ভারি চমৎকার সূক্ষ্ম শৌখিন সেলাই—চিকনের কাজ, সল্মা-চুম্‌কি-জরির কাজ, পুঁতির কাজ ইত্যাদি করতেন। নিজের হাতে সুখাদ্য তৈরী করে আদর যত্ন করে খাওয়াতে সব মেয়েরাই ভালবাসে—আমার 'বাছবিচার' নাই, তাঁদের হাতের খাবার খেতে কোন বাধা নাই, জেনে তাঁরা কী খুশী যে হতেন। এ বিষয়ে কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আমি বেশ একাত্ম বোধ করতাম, কারণ আমিও ভুক্তভোগী কিনা! নানা জায়গায় ঘুরতে হত। যেখানেই যেতাম সেখানকার মেয়েদের কাছে অনেক আদরযত্ন পেতাম, আমার কাছেও তাঁরা এসে কত হাসিগল্প মেলামেশা করতেন, কিন্তু আমার বাড়িতে একটু মিষ্টিমুখ করবার নামেই তাঁদের 'অম্বলের ব্যামো' হত! তরুণীদের মধ্যে অনেকের মনে যদিও এসব বিচার ছিল না, তবু তাদের তো গৃহিণীদের আদেশ মেনেই চলতে হত! একবার একটি মেয়ে আমার কাছে একটা নতুন রান্না শিখতে চেয়েছিল—তার স্বামী নাকি আমাদের বাড়িতেই সেই জিনিসটি খেয়ে খুব পছন্দ করেছিলেন। আমি তাকে রান্নার প্রণালীটা বুঝিয়ে দিয়ে হেসে বল্‌লাম, 'আমার হাতে তো খাবে না, নাহ'লে শুধু মুখে না বলে, রেঁধে তোমাকে খাইয়ে দেখাতাম!' মেয়েটি আমাকে বড় ভালোবাসতো, এই সামান্য কথাতেই তার চোখে

জল এসে গেল—বলল, 'দিদি, তোমার হাতে কেন, তোমার পাতে খেতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু তাহ'লে যে শাশুড়ি আর আমাকে হেঁশেলে ঢুকতেই দেবেন না।'

কিছুকাল আগে পর্যন্ত তো বিহার বঙ্গ প্রদেশেরই একটি অঙ্গ ছিল, কিন্তু এ অঞ্চলটি ছিল অত্যন্ত রক্ষণশীল। বাংলাদেশে মেয়েদের মধ্যে যে নূতন আদর্শে পূর্ণতর জীবনের সূচনা হয়েছিল, তার প্রভাব এখানে তখনও বোঝা যায়নি। তবু শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এখানে তখন বাঙ্গালিরাই অগ্রসর ছিলেন। যেখানে কয়েকঘর শিক্ষিত উদারমনা বাঙ্গালি সেখানেই তাঁরা নিজেদের চারিপাশে একটুখানি উদার পরিবেশ সৃষ্টি করে নিয়েছিলেন।

ছেলেদের স্কুল তবু অনেক জায়গায় ছিল, কিন্তু মেয়েদের স্কুলের নিতান্তই অভাব ছিল—নিজেদের মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা তাঁদের নিজেদেরই করে নিতে হত। হয়তো দু-একটি শিক্ষিতা নারী নিজেদের এবং পাড়ার কয়েকটি মেয়েকে নিয়ে পড়াতে আরম্ভ করলেন, দেখাদেখি আরো মেয়ে জুটে গেল, ক্রমে ছাত্রীসংখ্যা বাড়তে লাগল, রীতিমত ক্লাস বসল। পাঁচজনের চেষ্টা ও সাহায্যে স্কুলটি দাঁড়িয়ে গেল। বিহার-উড়িষ্যা-ছোটনাগপুরের অনেকগুলি নামকরা পুরনো স্কুলের এইভাবে অল্প কয়েকটি উৎসাহী লোকের উদ্যমে সামান্য সম্বল নিয়ে আরম্ভ হয়েছিল, এবং তাদের মূলে ছিল কয়েকটি শিক্ষানুরাগিণী নারীর ঐকান্তিক চেষ্টা যত্ন এবং অক্লান্ত পরিশ্রম। তাঁদের নাম এখন হয়তো লোকে ভুলে গিয়েছে, কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত সেখানকার স্থানীয় লোকেদের মুখে তাঁদের কথা শুনতে পেতাম। নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে, নিজেও এইরকমে কয়েকটি ছোট ছোট স্কুলের জন্ম হ'তে দেখলাম।

শিক্ষিত বিহারিদের মধ্যেও দু-একজন বাংলা স্কুলে মেয়েকে পড়াতেন। একবার, দূর মফঃস্বলে 'টুর' করতে গিয়ে, একটি বিহারি যুবকের বাড়িতে গ্রামোফোনে সুন্দর সুন্দর বাংলা গান শুনে খুব ভাল লাগলো। আমার স্বামী জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি তো বাংলা জানেন না, এত বাংলা রেকর্ড কোথা থেকে এল?' তিনি হেসে উত্তর দিলেন যে, ওগুলি নাকি তাঁর বউয়ের পছন্দে কেনা—সে এখন ভাগলপুরে তার বাপের বাড়িতে আছে ; সেখানকার বাংলা স্কুলে পড়ে, বউ নাকি একদম বাঙ্গালি বনে গিয়েছে! আরো দু-একটি বিহারি মেয়ে দেখেছিলাম—বাংলা স্কুলে পড়ে, তাদের কথাবার্তা, কাপড় পরা, চুল বাঁধা, ঠিক বাঙ্গালি মেয়েদের মত হয়েছে। ছোট ছোট শহরে মেয়েদের স্কুল ছিল না। সে রকম জায়গায় যখন যেতাম, কোথা থেকে সন্ধান পেয়ে, বই-খাতা-পেন্সিল হাতে দু-চারটি ছোট মেয়ে এসে হাজির হত। আমার মেয়েদুটিকে যখন বাড়িতে পড়াতে আরম্ভ করলাম, তখন তাদেরও কয়েকটি সঙ্গী জুটে গেল। লেখাপড়া শিখবার ইচ্ছাটা তো বোঝা যাচ্ছিল, কিন্তু দশ-বারো বছরেই যদি বিয়ের চেষ্টা হয়, তবে তার মধ্যে লেখাপড়া আর কতটুকু হতে পারে? আমাদের পরিচিত এক ভদ্রলোক তাঁর বারো বছরের মেয়ের জন্য সুপাত্রের সন্ধানে কলকাতায় যাচ্ছিলেন, আমার স্বামী তাঁকে বললেন, 'এত ছোট মেয়ের কেন বিয়ে দিতে চাইছেন? আরো দু-চার বছর পড়াশোনা করুক না?' তিনি বললেন, 'আমার তো তাই মত, কিন্তু আমার মা আর স্ত্রী মিলে আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছেন!' কলকাতায় গিয়ে ভদ্রলোক

দেখলেন যে, সেখানকার হাওয়া বদলিয়ে গিয়েছে। শিক্ষিত সুপাত্রের জন্য বারো বছরের 'খুকী' কেউ চান না, সকলেই লেখাপড়া জানা বড় মেয়ে খোঁজেন।

বড় বড় শহরে কখনও কখনও আধুনিক ধরনে সভা বা 'পার্টি' ইত্যাদি হত। সেখানে সাহেব-মেমরা থাকতেন, গণ্যমান্য দেশী লোকেরা অনেকে থাকতেন, কিন্তু দেশী মেয়েদের খুব কমই দেখা যেতো। অধিকাংশ শিক্ষিত উচ্চপদস্থ লোকেদের স্ত্রীরা ছিলেন পর্দানশীন। পর্দার দেশে, মেয়েদের মধ্যে মেলামেশা করার জন্য 'পর্দা-পার্টি'র ব্যবস্থা ছিল। বড় বড় মেম-সাহেবরা দেশী মেয়েদের সঙ্গে মিশবার উদ্দেশ্যে পর্দা-পার্টি দিতেন। ধনী ও উচ্চপদস্থ লোকেদের গৃহিণীরা বড় মেম-সাহেবদের খাতির করে পর্দা-পার্টি দিতেন, কোন কোন রানীও মাঝে মাঝে পর্দা-পার্টি দিতেন, নিজে পর্দানশীন না হলেও পর্দা-পার্টিতে যেতে আমার খুব মজা লাগত। পর্দার ব্যবস্থা থাকলেও খুব রক্ষণশীল মেয়েরা এতে যোগ দিতেন না, তবে বাঙ্গালি, বিহারি, ওড়িয়া, অনেক পর্দানশীন মেয়েরা আসতেন। তাঁরা ইংরাজি জানেন না, পরস্পরের ভাবও ভাল জানেন না, মেম-সাহেবরাও কষ্টে ভাঙা ভাঙা হিন্দী বলেন—বিচিত্র 'খিচুড়ী' ভাষায় আলাপ চলতো। মাঝে মাঝে ভাষা-সংকট উপস্থিত হলে, আমাকে দো-ভাষীর কাজ করতে হত। তবু, নানারকম মেয়েরা মিলে, হাসি গল্প আলাপে পার্টি বেশ জমে উঠত।

বড়ঘরের মেয়েরা পারতপক্ষে বাড়ির বাহিরে যেতেন না বটে, তবে ভালরকম পর্দার ব্যবস্থা থাকলে, মধ্যবিত্ত ও ভদ্রঘরের মেয়েরা অনেকেই অভিনয় বা কোনোরকম 'তামাশা' দেখতে যেতেন। পর্দার ব্যবস্থাও হত চমৎকার। রাঁচিতে যখন রাজধানী ছিল, বিহারের একজন জনপ্রিয় ছোটলাট বৃদ্ধবয়সে কাজে অবসর নিয়ে দেশে ফিরে গেলেন—মহা সমারোহে তাঁকে বিদায়-অভিনন্দন বা 'ফেয়ার-ওয়েল পার্টি' দেওয়া হল। এত ঘটা হবে, মেয়েদের দেখবার ভারি সাধ হ'ল, তাঁদের জন্য বেশ অভিনব ব্যবস্থা দেখলাম। সেক্রেটারিয়েটের সামনের ময়দানে, মাঝখানে প্রকাণ্ড দরবার সামিয়ানার নীচে আসল অনুষ্ঠান, আর সারা মাঠ জুড়ে চারিদিকে ম্যাজিক, পুতুলনাচ, বাজনা, আতসবাজি ইত্যাদি নানা তামাশার আয়োজন হয়েছে। দরবার-সামিয়ানার কাছে আরেকটা বড় সামিয়ানা করে তার চারিধার চিক দিয়ে ঘিরে দেওয়া হল—ঠিক যেন প্রকাণ্ড একটি খাঁচার মত দেখতে হল। পিছনের কানাত্-ঘেরা রাস্তা দিয়ে সেই খাঁচায় ঢুকে, যেমন করে চিড়িয়াখানার জীবরা বাইরের জগৎটাকে দেখে, তেমনি করে মেয়েরা চারদিকের দৃশ্য দেখলেন।

বিহার, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুরে ছোটবড় অনেক রাজামহারাজা ছিলেন—কেহ বা সামন্ত রাজা, কেহ বা রাজা উপাধিধারী জমিদার। এক মহারাজা প্রৌঢ় বয়সে আরেকটি বিবাহ করলেন, তার কয়েকদিন পরেই রাজপ্রাসাদে লেডী ডাক্তারের ডাক পড়লো—নতুন মহারানী নাকি অসুস্থ। ডাক্তার গিয়ে দেখলেন যে, মোটা মোটা ভারি ভারি গহনায় রানীর দুই হাত যেন সোনা দিয়ে মোড়া। দারুণ গ্রীষ্মে সেই তপ্ত সোনার 'ছেকা' লেগে ননীর মত শুভ্র কোমল হাত দুখানি লাল হয়ে ফুলে ফোস্কা পড়ে গিয়েছে! তখনই বেশীর ভাগ গহনা খুলে দিতে বললেন, কিন্তু তা তো হবার উপায় নাই। নববধূকে একমাস রাত্রিদিন

ঐ পুরো সেট গহনা পরে থাকতে হবে, এই নাকি সেই রাজবাড়ির নিয়ম! অগত্যা ডাক্তার অনবরত ওষুধ লাগাবার ব্যবস্থা দিলেন—চারজন দাসী সমস্তক্ষণ পাশে বসে, একে একে গহনাগুলি যতটুকু সম্ভব সরিয়ে, সেই ফাঁকে ওষুধ-পাউডার ঘষে দিতে থাকল। একটি মাস এই যন্ত্রণা ভোগ করে, তবে মহারানী কিছু গহনা খুলে রাখবার অনুমতি পেলেন। ততদিনে তাঁর দুই হাতে ঘা হয়ে এবং শুকিয়ে কালো কালো দাগ পড়ে গিয়েছে।

আরেকজন সামন্ত রাজার দেখলাম বাইশ বছর বয়সেই দুই রানী! রাজমাতা আর রাজার বিধবা বোনও সঙ্গে আছেন। তখন তো বিজলীপাখা ছিল না, ঘরে গিয়ে বসতেই আমাদের প্রত্যেকের পিছনে একজন করে দাসী ময়ূরপাখা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। আরেকজন রুপোর উপরে সোনার মীনা করা মস্ত একটা থালাতে সেইরকম পানদানী আর মশলার কৌটা সাজিয়ে নিয়ে, ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করতে লাগল। তাঁরা কথা বলছেন, আর অনবরত পান খাচ্ছেন—আমার তো একটি পান মুখে দিয়েই উগ্র মশলার গন্ধে মাথাটা যেন ঘুরে গেল। বড়রানীই দেখলাম, শাশুড়ীর খুব আদরিণী, তিনিই ঘুরে ঘুরে আমাদের অন্দরমহলটি দেখালেন। সেকেলে ধরনের শাড়িপরা আর চুল বাঁধার ছাঁদে বড় বড় মুক্তোর ঝালর দেওয়া চমৎকার সাবেকী গহনাতে, রূপসী তরুণী রানীকে অপরূপ সুন্দর লাগছিল দেখতে। ছেলেবেলায় গল্প শুনতাম যে, রাজরানীরা 'রুপোর পালঙ্কে পা রেখে, সোনার পালঙ্কে বসেন', বড়রানীর হাতির দাঁতের কাজকরা প্রকাণ্ড পালঙ্কের পাশে চমৎকার জালি কাজ করা সুন্দর ছোট্ট একটি খাট, তার উপরে বিরাজ করছে বিরাট একটি রুপোর গড়গড়া। ধূমপান মেয়েদের মধ্যে বেশ প্রচলিত ছিল, অনেক গৃহিণীর হাতে হুঁকো দেখতাম—আমার জন্যও তাঁরা সিগারেট আনিয়ে রাখতেন। আমাদের আদর অভ্যর্থনার যাতে কোনরকম ত্রুটি না হয়, বাহির থেকে রাজা বারবার তদারক করে যাচ্ছিলেন। যতক্ষণ তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন ততক্ষণ ঘরের মধ্যে রানী হাত দুটি জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকছিলেন।

কোনও সূত্রে এই রাজপরিবারের সঙ্গে আমাদের কিছু ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, সেইজন্যই রাজমাতা আমাদের কাছে অসঙ্কোচে তাঁদের জীবনের অনেক সুখদুঃখের কথা বলতেন। এইসব ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরের অন্তরালে কত যে অশ্রুজল ও দীর্ঘশ্বাস, কত হিংসা হানাহানি ও কুটিল চক্রান্ত লুকিয়ে থাকতো, রাজমাতার মুখে সে-সব কাহিনী শুনে মনে হত যেন কোনও উপন্যাসের গল্প শুনছি!

রাজরানী বা ধনী গৃহিণীই হোন আর মধ্যবিত্ত বা দরিদ্রের ঘরণীই হোন, সকলেরই জীবন পর্দা-ঘেরা ছিল। পর্দা ছিল ভদ্রমহিলার মানসম্ভ্রমের প্রতীক। সুতরাং পর্দার বাহিরে আসার কথা তাঁরা ভাবতেই পারতেন না—বাহিরের দুনিয়াটার সম্বন্ধে অনেকেরই মনে যেন জুজুর ভয় ছিল। এই যে সহস্র সহস্র নারী পর্দার পিঞ্জরের ভিতরেই দিন কাটাতেন, তাঁদের সুখ-দুঃখের খবর কে রাখতো? কেই বা তাঁদের জন্য ভাবতো? তাঁরা যে খেলার পুতুল নন, মানুষের মতন করে বাঁচবার দাবি যে তাঁদেরও আছে, সে কথা তাঁরা নিজেরাও অনেকে বুঝতেন না।

এর মধ্যে কতবার কলকাতায় যাওয়া-আসা করলাম, সেখানে মেয়েদের শিক্ষা ও

উন্নতির জন্য কত নতুন ব্যবস্থা দেখলাম, এই দশ-বারো বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশে মেয়েদের জীবনে কত পরিবর্তন এসে গেল ; তার তুলনায় মনে হত, এ দেশের মেয়েরা যেন এখনও ঘুমিয়ে রয়েছেন।

রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ অগাস্ট, ১৯৬৪.

বাহির দুয়ার

বাংলাদেশে মেয়েদের উন্নতির জন্য যত কিছু উদ্যম ও আয়োজন কলকাতাই ছিল যেন তার প্রাণকেন্দ্র। এখান থেকেই যত নূতন নূতন প্রেরণা ও পরিকল্পনা অন্য শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়তো। পর্দার দেশ থেকে কলকাতায় এলেই এখানকার নারীসমাজের মধ্যে একটা সজীব স্বচ্ছন্দ আবহাওয়া বেশ অনুভব করতাম।

মেয়েরা এখন ঘোমটা খুলে সহজভাবে চলাফেরা করছেন। প্রায় সব মেয়েই অন্তত চোদ্দ পনেরো বছর পর্যন্ত পড়াশোনা করছে: তাদের মধ্যে গানবাজনা ও শিল্পচর্চার আদরও বেড়েছে। উচ্চশিক্ষারও ক্রমেই প্রসার হচ্ছে। এই দশ বৎসরে কলকাতায় আরো দুটি মেয়েদের কলেজ হল। বিবাহিতা মেয়েরাও কতজনে আবার নূতন করে পড়াশোনা ধরলেন। মা আর মেয়েকে একসঙ্গে ম্যাট্রিক এবং বি-এ পরীক্ষাও পাশ করতে দেখলাম। শিক্ষিতা মেয়েদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে, মেয়েদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষাদানের ভার প্রধানত মেয়েরাই হাতে নিচ্ছেন। অন্য নানারকম নারীকল্যাণের কাজেও তাঁরা এখন এগিয়ে আসছেন।

বিধবা-বিবাহ সমাজে প্রচলিত হয়নি, অথচ অল্পদিন আগে পর্যন্ত বাল্য-বিবাহই নিয়ম ছিল। সুতরাং অল্পবয়সে বিধবা মেয়ের সংখ্যা ছিল অনেক। এঁদের মধ্যে অনেকেই লেখা-পড়া শিখবার সুযোগ পেতেন না। 'বিধবা নারী অলক্ষণা,' এইরকম একটা হৃদয়হীন সংস্কার অনেকের মনে থাকাতে, একটুখানি স্নেহসহানুভূতিপূর্ণ আশ্রয়ও সকলের ভাগ্যে জুটতো না। অনেকেই অপরের গলগ্রহ বা অনুগ্রহপ্রার্থী হয়ে থাকতে বাধ্য হতেন। লেখাপড়া ও শিল্পের চর্চা যাতে এঁদের নিরানন্দ ব্যর্থ জীবনে একটুখানি সার্থকতার আনন্দ এনে দিতে পারে, এঁদের স্বাবলম্বী হয়ে সম্মানের জীবনযাপন করতে সক্ষম করে, সেই উদ্দেশ্যে বিধবা মেয়েদের জন্য কতগুলি প্রতিষ্ঠান মহিলারাই পরিচালনা করছিলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম দিকে স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা হিরণ্ময়ী দেবী কলকাতায় মহিলা বিধবা আশ্রম নামে একটি শিল্পশিক্ষার স্কুল খুলেছিলেন। যতদূর জানি এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এটিই সব চেয়ে পুরনো।[৪২] এখানে কিছু সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে নানারকম শৌখিন এবং কার্যকরী শিল্প শেখানো হত। স্কুলটির বেশ সুনাম হয়েছিল। আশ্রমের বিধবা মেয়েরা ছাড়া বাহির থেকেও অনেক মেয়ে এখানে শিখতে আসতেন। হিরণ্ময়ী দেবীর মৃত্যুর পরে মহিলা বিধবা আশ্রমের নাম হয় 'হিরণ্ময়ী বিধবা আশ্রম'।

স্বর্ণকুমারী দেবীর অন্য কন্যা সরলা দেবীর উদ্যোগে অন্তঃপুরবাসিনী মেয়েদের শিক্ষার জন্য 'ভারত-স্ত্রী মহামণ্ডল' গঠিত হয়[৪৩]—মহামণ্ডলের শিক্ষিকারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে পর্দানশীন মেয়েদের নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। ভারতের নানা প্রদেশে মহামণ্ডলের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

অনেকদিন আগে একবার দার্জিলিংএ একটি গাউনপরা বাঙালী মহিলাকে দেখে কেন জানি না বড় ভাল লেগেছিল। তিনি প্রায়ই আমাদের মায়ের সঙ্গে গল্প করতেন।

মার কাছেই শুনেছিলাম যে তিনি খৃশ্চান নন হিন্দু মহিলা—চোদ্দ বৎসর স্বামীর সঙ্গে বিলাতে থেকে সম্প্রতি দুজনে দেশে ফিরেছেন—নাম তাঁর কৃষ্ণভাবিনী দাস।[৪৪] প্রায় পনেরো বৎসর পরে আবার কলকাতায় কৃষ্ণভাবিনী দাসকে দেখলাম খালি পা মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, সাদা থান পরা, বিধবার বেশে। একই বৎসরের মধ্যে স্বামীকে আর একমাত্র সন্তান মেয়েটিকে হারিয়ে[৪৫] তিনি এখন নারীকল্যাণ ব্রতে জীবন উৎসর্গ করেছেন। সে-সময়ে তিনি ভারত-স্ত্রী মহামণ্ডলের বাংলা শাখার ভার নিয়ে সেটিকে গড়ে তুলছিলেন। প্রায়ই আমাদের মার কাছে আসতেন, আমরাও তাঁর উইলিয়াম্‌স্ লেনের বাড়িতে যেতাম। এমন ধীর, নম্র মধুর স্বভাব, এমন কোমল উদার মহৎ হৃদয় খুব কমই দেখেছি। আজন্ম সুখে সম্পদে অভ্যস্ত হয়েও তিনি গরীবের মত সামান্য ভাবে থাকতেন, খালি পায়ে হেঁটে বাড়ি বাড়ি ঘুরে সকলের সুখ দুঃখের সংবাদ নিতেন আর সাধ্যমত সাহায্য করতেন। নিজের বাড়িতেও কতগুলি অনাথা মেয়েকে আশ্রয় দিয়েছিলেন—মায়ের মত তাদের স্নেহযত্ন করতেন।

শুধু তো শহরে নয়, দূর পল্লীর গ্রামের মধ্যেও কত লক্ষ নারী বাস করেন, তাঁদের অভাব ও প্রয়োজন মেটাবার জন্য নারী শিক্ষাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হল। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল—গ্রামে গ্রামে মেয়েদের জন্য বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা, আর মায়েদের জন্য মাতৃমঙ্গল ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র গঠন করে, তাঁদের স্বাস্থ্যতত্ত্ব, সন্তান পালন, শুশ্রূষা ও ধাত্রীবিদ্যা ইত্যাদির সঙ্গে নানারকম কুটিরশিল্প শিক্ষা দেওয়া। বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে এই সমিতি, বহু সংখ্যক বালিকা বিদ্যালয় আর কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। গ্রামের মেয়েরা অতি আগ্রহের সঙ্গে তাতে যোগ দিয়েছেন। বিদ্যালয়গুলি সমিতিই প্রথমে গড়ে তুলেছে তারপর অনেক স্থলে স্থানীয় লোকেই কমিটি গঠন করে সেগুলি চালাবার ভার নিয়েছেন। কলকাতা শহরেও সমিতির স্থাপিত কয়েকটি স্কুলের মধ্যে দুটি মুরলীধর[৪৬] এবং বেলতলা[৪৭] পরে কলেজে পরিণত হয়েছে। গ্রামের স্কুল এবং কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষা দেবার উপযুক্ত শিক্ষিকার অত্যন্ত অভাব দেখে সমিতি নিজেই ঐ কাজের যোগ্য শিক্ষিকা তৈরি করে নেবার ভার হাতে নিল। বাল্য বিধবার দুঃখে যাঁর প্রাণ কেঁদেছিল, সেই মহাপ্রাণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামে 'বিদ্যাসাগর বাণী ভবন' ট্রেনিং স্কুল[৪৮] খুলে, বিশেষভাবে গ্রামে শিক্ষা দেবারই উপযুক্ত শিক্ষিকা গড়ে নেবার ব্যবস্থা করল। বাণীভবনে শিক্ষালাভ করে আজ পর্যন্ত কয়েকশত বিধবা নারী বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের সাহায্য করেছেন। এই কল্যাণের কাজে তাঁদের নিজেদের জীবনও অনেক পরিমাণে সার্থক হয়ে উঠল। নারী শিক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী এবং প্রাণস্বরূপা ছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্রের পত্নী, শ্রীযুক্তা অবলা বসু।[৪৯]

দেশের মেয়েদের শিক্ষা ও কল্যাণের জন্য যাঁরা কাজ করছিলেন তাঁদের কথা বলতে গেলেই বিশেষভাবে মনে পড়ে দুই বোনের কথা—ডক্টর পি কে রায়ের[৫০] পত্নী সরলা রায়[৫১] এবং আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর পত্নী অবলা বসু—এঁরা দুজন প্রসিদ্ধ সমাজ সংস্কারক দুর্গামোহন দাসের[৫২] কন্যা। দুজনেরই একাগ্র নিঃস্বার্থ কর্মনিষ্ঠা গঠন ও পরিচালনার অসাধারণ ক্ষমতা এবং অকৃত্রিম সৌজন্য ও সহৃদয়তা সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ

করেছিল। সারা জীবন নানারকম নারীকল্যাণের কাজের সঙ্গে এঁরা যুক্ত ছিলেন, তার মধ্যে সরলা রায়ের প্রধান কীর্তি গোখলে মেমোরিয়াল স্কুল ও কলেজ[৫৩] আর অবলা বসুর প্রধান কীর্তি নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

রানীগঞ্জ, ঝরিয়া প্রভৃতি জায়গার কয়লাখনিতে অনেক শিশু ও নারীশ্রমিক কাজ করতো। তখনকার দিনে তাদের অত্যন্ত দুরবস্থা ছিল। ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলী এবং কবি কামিনী রায়[৫৪] বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার সমস্ত কয়লাখনি অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে এইসব শ্রমিকদের দুঃখদুর্দশার কথা তাদের মুখে শুনে এবং স্বচক্ষে দেখে এসেছিলেন। তাঁদের সেই অভিজ্ঞতার বর্ণনা তাঁদের কাছেই শুনেছিলাম। এ বিষয়ে তদন্ত কমিটিতে তাঁরা যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন, তার ফলে নারীশ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি আর শিশুদের কাজে নিয়োগ বন্ধ করবার অনেক সাহায্য হয়েছিল।

জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম মহিলা প্রতিনিধিদের মধ্যে দুজন বাংলার মেয়ে ছিলেন, স্বর্ণকুমারী দেবী আর কাদম্বিনী গাঙ্গুলী। আবার কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন দেখলাম (১৯১৭)—সেই প্রথম কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করলেন একজন নারী—শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ত।[৫৫] ইংরাজ মহিলা হয়েও তিনি ভারতবর্ষকেই স্বদেশ বলে মনে করেছিলেন এবং ভারতের মুক্তির জন্য যাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ ও অক্লান্ত চেষ্টা ছিল। সেই প্রথম শুনলাম সরোজিনী নাইডুর[৫৬] বক্তৃতা। এর আগে তাঁর কবিতা পড়ে ভাল লেগেছিল, এখন কবিতার মতই সরস মধুর আবেগময় তাঁর ভাষণে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম! একজন ভারতীয়া মহিলার মুখে এমন অপূর্ব ইংরাজি শুনে মনে বেশ গর্ব বোধ হল। একথাও ভুললাম না যে, তিনিও বাংলারই মেয়ে! আজন্ম বাংলার বাইরে বাস, বিলাতে শিক্ষালাভ এবং ভিন্ন প্রদেশে বিবাহ হওয়ার দরুন তাঁর মধ্যে বাঙালীত্বের চিহ্ন বোঝা যেতো না। তিনি ছিলেন সর্বভারতের। দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠা নারীদের মধ্যে তাঁর সম্মানের আসন ছিল। কিন্তু অল্পদিন আগেই তাঁর বাবা-মাকে দেখেছিলাম। তাঁর মা[৫৭] ছিলেন চেহারায়, চালচলনে, পোশাকে, কথাবার্তায় পুরোপুরি বাঙালী মহিলা। কাছে গিয়ে প্রণাম করতেই, কিগো, নাতনি? বলে ঠিক ঠাকুরমা দিদিমাদের মতোই জড়িয়ে ধরে আদর করলেন (শ্রীমতী নাইডুর পিতা ডক্টর অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়[৫৮] আর আমার মাতামহ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় দূরসম্পর্কের ভাই হতেন)। সেই মায়ের মেয়ে সরোজিনীকে বাংলার মেয়ে বলে ভাবতে একটুও অসুবিধা হল না। সেই প্রথম কংগ্রেসের একটি নারী স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী গঠিত হল—সেবার মহিলা প্রতিনিধি ও দর্শকের সংখ্যা হয়েছিল অনেক, তাঁদের সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের তত্ত্বাবধান করবার জন্যই একদল স্বেচ্ছাসেবিকার প্রয়োজন বোধ হয়েছিল।

ইতিপূর্বেই ইউরোপে প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল, এই সময়ে মহাসমর পাঁচ বছর চলল। ভারতের ভাগ্য তখন বৃটেনের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত ছিল, সঙ্কটকালে ভারতের ধনবল ও জনবল বৃটেনের প্রধান সম্বল হল। যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতীয় সৈন্যের বীরত্বের খ্যাতিতে দেশবাসীর মন গর্বে ভরে উঠল, বাঙালীর কাছে আরেক বিশেষ গর্ব ও আদরের জিনিস হল—নতুন গঠিত বেঙ্গল রেজিমেন্ট বা 'বাঙালী পল্টন'।[৫৯] বাঙালী পল্টনের জন্য

বাংলার মেয়েরা বিস্তর অর্থসংগ্রহ করেছিলেন। সেই টাকাতে তাঁরা সৈনিকদের জন্য নানারকম খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস উপহার পাঠালেন। এবার চীনা আক্রমণের সময়ে, জোয়ানদের জন্য পাড়ায় পাড়ায় মেয়েদের পশম বুনতে আর 'জ্যাকেট' তৈয়ারী করতে দেখে সেই পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা আমার মনে পড়ছিল।

চার বৎসরে বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল। আপাতত মনে হল যেন বিশ্বে শান্তি ফিরে এল, কিন্তু এবার দেশের মধ্যেই ঘোর অশান্তি দেখা দিল। অশান্তির সূত্রপাত অবশ্য আগে থাকতেই হয়েছিল। শিক্ষিত দেশবাসীর মনে জাতীয় চেতনা জেগে ওঠার সঙ্গে, নিজেদের দেশের শাসনকাজে যথাযোগ্য অংশ এবং দায়িত্ব নেবার আকাঙ্ক্ষা স্বভাবতই জেগে উঠেছিল, এবং তাঁদের সেই ন্যায্য দাবি পূরণ করতে শাসনকর্তাদের অনিচ্ছা ও ঔদাসীন্যে লোকের মনে ক্রমেই অসন্তোষ জমে উঠছিল।

মহাযুদ্ধের পরে নানা কারণে এই অসন্তোষ ও আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠল ; গভর্নমেন্টও তার বিরুদ্ধে কঠোর দমননীতি অবলম্বন করলেন—যার চূড়ান্ত হল, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড।[৬০] এই ব্যাপারে সমস্ত ভারতবাসীর মনে যে কী দারুণ বিক্ষোভ ও বেদনা জেগে উঠল, সেসব দিনের কথা ভুলবার নয়। এবার মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আরম্ভ হল দেশব্যাপী 'অহিংস অসহযোগ' আন্দোলন। হিন্দু-মুসলমান সকলেই, বিশেষভাবে ছাত্র ও তরুণদল, এতে আশ্চর্যভাবে সাড়া দিল। দেশের নারীরাও এবার প্রকাশ্যভাবে আন্দোলনে যোগ দিলেন। নেতাদের পাশে যখন তাঁদের মাতা, পত্নী, কন্যা, ভগ্নীরাও এসে দাঁড়ালেন, তখন দলে দলে নারী তাঁদের অনুসরণ করে প্রচার, পিকেটিং ইত্যাদি কাজে নামলেন। সেই থেকে দেশের নারীদের সামনে একটি নূতন কর্মক্ষেত্র উন্মুক্ত হল।

বিহারে তখন পর্দাপ্রথা প্রবল থাকাতে মহিলারা প্রকাশ্যভাবে আন্দোলনে যোগ দেননি। সেখানকার কয়লাখনি অঞ্চলে বসে, সে সময়ে শুধু রেলওয়ে এবং কয়লাখনির জোরালো ধর্মঘট দেখলাম। কয়লাখনিতে কাজ বন্ধ, রেল চলাচল প্রায় বন্ধ, স্থানীয় 'সাহেব'দেরও প্রায় অচল অবস্থা—বেচারাদের যাকে বলে 'ধোপা-নাপিত বন্ধ',—তার উপর দোকান-বাজারও বন্ধ। শ্রমিকরা ধর্মঘট করতো, আর ওদিকে তাদের বাড়ির মেয়েরা শহরের বাড়ি বাড়ি ঘুরে সাহায্য ভিক্ষা করত, 'মরদগুলান্ যে বইস্যে গেল, ইবারে ছেল্যাগুলান্ কি ভুখে শুখাঁয়ে মরবে?'

দেখতে দেখতে আন্দোলনের বন্যা দেশকে প্লাবিত করল ; কিন্তু বন্যার মতই, অল্পকালের মধ্যে তা থেমে গেল। জনসাধারণ মনের আবেগে এ আন্দোলনে যোগ দিলেও, অহিংসার আদর্শের জন্য অনেকেরই মন যথেষ্ট প্রস্তুত ছিল না। উত্তেজিত জনতা বার বার অহিংসার আদর্শ ভুলে গিয়ে ক্ষিপ্ত ও হিংস্র হয়ে উঠল, তখন গান্ধীজী বাধ্য হয়ে আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন।

অন্যদিকে, এই অসহযোগ আন্দোলনই দেশবাসীকে হাতে কলমে সহযোগ শিক্ষা দিল—সকল শ্রেণীর লোক একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, একযোগে কাজ এবং একসঙ্গে দুঃখ ভোগ করার ফলে, ভারতবাসী মনেপ্রাণে অনুভব করল যে, বাহিরে নানা প্রভেদ সত্ত্বেও

তারা এক ভারতমাতার সন্তান—'এক জাতি, এক মন প্রাণ।' এই একতার উপলব্ধি দেশের নরনারীর প্রাণে নূতন শক্তি ও উদ্যমের সঞ্চার করল ; এতদিন যে দেশপ্রেম ও জাতীয় চেতনা শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, এবার সেই ভাব ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সব শ্রেণীর সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। এক সময়ে বাংলাদেশে যেমন দেখেছিলাম, তেমনিভাবে, সারা দেশের নারীসমাজের মধ্যেও এবার যেন এক নবজীবনের সাড়া জেগে উঠল—সমগ্র নারীসমাজের শিক্ষা এবং সামাজিক উন্নতির জন্য সমবেত চেষ্টা আরম্ভ হল।

পর্দার আবরণ ভেদ করে, বিহারের অন্তঃপুরে এই সাড়া জাগতে কিছু দেরী হল। নূতন বিহার প্রদেশ গঠনের সময় থেকেই অনেক শিক্ষিত বিহারবাসীর মনে নিজেদের উন্নতির সম্বন্ধে উচ্চ আশা জেগেছিল, কিন্তু বন্ধনশীল সমাজের প্রতিকূলতায় সে উন্নতি খুবই ধীরে ধীরে চলছিল। মেয়েদের শিক্ষার জন্য কতগুলি স্কুল ছিল, একটি দুটি করে আরও স্কুলও হল, কিন্তু প্রথম প্রথম যে-কয়টি মেয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করল, তারা প্রায় সবাই বাঙালী! ক্রমে বিহারী মেয়েরাও পাশ করতে আরম্ভ করল, তাদের উচ্চশিক্ষার জন্য ব্যবস্থাও হল। প্রথম যখন পাটনায় একটি মেয়েদের কলেজ করবার প্রস্তাব হয়, তখন সেখানকার স্কুল ইন্সপেকট্রেস্ মেমসাহেব তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন—'এ বৎসর তিনটি বিহারী মেয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেছে—তার মধ্যে একজনের বিবাহ ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে, আরেকজনের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হয়েছে এবং তৃতীয়টি আশা করছে যে, তার বিবাহও শীঘ্রই হবে!' বিবাহের পরেই নববধূকে পর্দার অন্তরালে চলে যেতে হত। সে ব্যূহের মধ্যে একবার প্রবেশ করলে, আর নিষ্ক্রমণের পথ নাই।

মেয়েদের উন্নতির পথে প্রধান বাধা এই পর্দাটাকে সরিয়ে ফেলবার জন্য কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও চেষ্টা হচ্ছিল। অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে কংগ্রেস এখন যে গঠনমূলক কাজ করছিল, তার একটা অঙ্গ ছিল—'পর্দা-বিমোচন'। কোনও সম্ভ্রান্ত পরিবারের একটি যুবক কিছুকাল আগে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। এবার তিনি তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিতে চাইলেন। স্ত্রীও আগ্রহের সঙ্গে রাজী হলেন। কিন্তু পরিবারের কর্তারা ঘোর আপত্তি তুললেন—তাঁদের বংশের বধূ সামান্য রমণীর মত পর্দার বাইরে গিয়ে কাজ করবে? সর্বনাশ! তাহলে তাঁদের মানসম্ভ্রম থাকবে কোথায়? সমাজে তাঁদের মাথা হেঁট্ হয়ে যাবে যে! বধূকে তাঁরা আটক করে রাখলেন। যুবকের বন্ধু একদল কংগ্রেসকর্মীও তখন সেই ধনীর প্রাসাদের সামনে সত্যাগ্রহ করলেন—কোন্ পক্ষের জয় হয়, দেখবার জন্য পাড়াপ্রতিবেশীদল ও কৌতূহলী জনতা উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল। হঠাৎ সেই সত্যাগ্রহ শিবিরের একটি তরুণ কর্মী সাংঘাতিক অসুখ হয়ে সেখানেই মারা গেল ; এই তরুণের অকালমৃত্যুতে সমস্ত লোকের সহানুভূতি সত্যাগ্রহীদের দিকেই ঝুঁকল। বাড়ির কর্তারাও এই ঘটনায় অত্যন্ত বিচলিত হলেন—বধূকে আর তাঁরা আটকিয়ে রাখতে পারলেন না, তাকে স্বামীর সঙ্গে যাবার জন্য ছেড়ে দিলেন। এই দম্পতির সঙ্গে পরে আলাপ হয়েছিল—তাঁরা তখন প্রাণমন দিয়ে 'বিহার মহিলা বিদ্যাপীঠ' গড়ে তুলছিলেন, তারই

জন্য চারদিকে ঘুরে চাঁদা সংগ্রহ করছিলেন। তাঁদের আত্মত্যাগ ও আদর্শনিষ্ঠার দৃষ্টান্ত আরো কতজনের প্রাণে প্রেরণা এনে দিয়েছিল।

এমনিভাবে, জরাজীর্ণ পর্দাটার ফাঁকে ফাঁকে, বাহিরের মুক্ত হাওয়া একটু একটু করে অন্তঃপুরে প্রবেশ করল, আর ভিতরের আধ-ঘুমন্ত মানুষগুলি একে একে সচেতন হয়ে উঠল। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যেই মেয়েদের শিক্ষা ও স্বাধীনতার আগ্রহ যেন সবচেয়ে বেশী দেখা গেল। সরকারী স্কুল-কলেজ ছাড়া, খৃশ্চান মিশনারীদের কতগুলি ভাল স্কুলে অনেক বাঙালী-বিহারী হিন্দু মেয়ে শিক্ষা পেত। এসব স্কুলে মেয়ে পড়াবার সঙ্গতি যাঁদের নাই, অথবা ইংরাজি ধরনের শিক্ষার পক্ষপাতী যাঁরা নন্, তাঁদের মেয়েদের অল্প খরচে জাতীয় আদর্শে শিক্ষা দেবার জন্যই 'বিহার মহিলা বিদ্যাপীঠ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সুন্দর বাগানবাড়িতে, আশ্রমের মত শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে, জৈন মহিলাদের 'বনিতা ভবন'টিও দেখে বেশ ভাল লেগেছিল।

সম্ভ্রান্ত বনেদী ঘরগুলি এতদিন যেন রক্ষণশীলতার অভেদ্য দুর্গ ছিল। এবার সেই অচলায়তনের গায়েও এখানে সেখানে ফাটল ধরল। নবীন রাজারা অনেকে আধুনিক শিক্ষা পেয়েছিলেন। কেহ কেহ তাঁদের রাণীদেরও আধুনিক আদর্শে তৈয়ারী করতে উৎসুক হলেন। কোন কোন রাণী আগেই মাতৃভাষায় কিছু শিক্ষিতা ছিলেন, এখন তাঁরা গভর্নেস্ রেখে ইংরাজি শিখলেন—দু'চারজন রাণী রাজাদের সঙ্গে বিলাতেও ঘুরে এলেন। এইরকম দুয়েকটি আধুনিক রাণীর সঙ্গে পরিচয় হল। পরে, কাজ উপলক্ষে কিছুকাল দেশীয় রাজ্যে ঘুরে বেড়াতেও হল। পাশাপাশি দুটি ছোট সামন্ত রাজ্য—এক রাজ্যের রাণী পর্দানশীন, সেখানে পর্দার খুব কড়াকড়ি। বাঙালী কর্মচারীদের স্ত্রীরাও পর্দার বাহিরে বেরতে সাহস পান না। সেখানে বিজ্‌লী আলো, কলের জল, মোটর সার্ভিস্ সবই আছে, কিন্তু মেয়েদের শিক্ষা এবং চিকিৎসার কোন সুব্যবস্থা নাই। সেদিকে রাণীর কোন আগ্রহও নাই! তারই পাশের রাজ্যটির রাণী শিক্ষিতা। বিলাতেও দুবার গিয়েছেন। তিনি পর্দা করেন না, সেখানকার মেয়েদেরও পর্দা নাই। মেয়েদের ভাল স্কুল এবং হাসপাতাল আছে। স্কুলে 'গার্ল গাইড্'ও আছে। গাইড্ দলের ক্যাপ্টেন রাজবাড়িরই একটি বধূ। মেয়েদের জন্য শহরের ক্লাব ও লাইব্রেরীতে আলাদা দিন নির্দিষ্ট আছে। প্রজাদের মুখে 'রাণীজী' বা 'রাণীমা'র বদলে সাদাসিধা 'মোমা' (মা) ডাকটিও শুনতে বেশ মিষ্টি লাগত।

আমার স্বামীর বন্ধু একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী একবার তাঁদের ক্যাম্পে আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সেখানে গিয়ে দেখি, সেই ক্যাম্পের মধ্যেও দিব্য পরিপাটি পর্দার ব্যবস্থা। ডাকবাংলোর সামনে কয়েকটি তাঁবুর মধ্যে সদরমহল, আর কানাত-ঘেরা বাংলোটির মধ্যে অন্দরমহল। আমাদের বড় মেয়েটি তখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, এর পর তাকে উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতায় পাঠাবার ইচ্ছা শুনে, বন্ধুপত্নী বার বার আমাকে বললেন, 'মেয়েকে আর কত পড়াবেন? এবার মেয়ের বিয়ে দেবেন না?' নিজেদের ছেলেটিকে অল্পবয়সে ছাত্র অবস্থাতেই বিয়ে দিয়েছেন। দুঃখ করলেন, 'বেয়াই বিলাতফেরৎ মানুষ কিনা, আগে থেকেই সর্ত করে নিয়েছেন যে, যতদিন

না ছেলে বি এ পাশ করবে ততদিন তাঁর মেয়ে তাঁদের কাছেই থাকবে—বউ এখনও বাপের বাড়িতে বসে পড়াশোনা করছে।' খুব আদর যত্নের মধ্যেই কয়েকটা দিন কাটিয়ে এলাম, কিন্তু স্বামীর বন্ধুটিকে একবারও দেখতে পেলাম না। আমার স্বামীও বন্ধুপত্নীকে চোখে দেখলেন না!

শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩ অগাস্ট, ১৯৬৪

ভবিষ্যতের সূচনা

দেশের নারীদের মন যখন সচেতন হয়ে উঠল, অতীতকে আঁকড়িয়ে ধরে ঘরের কোণে বসে না থেকে, নবযুগের নূতন জীবনযাত্রার তালে পা ফেলে অগ্রসর হবার জন্য তাঁরা উৎসুক হলেন—তাঁদের এগিয়ে নিতে হাত বাড়ালেন একদল নারী, সে পথে চলবার মত শিক্ষা ও স্বাধীনতালাভের সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল। নানা প্রদেশে অনেক শিক্ষিতা নারী তাঁদের নিজ নিজ অঞ্চলে নারীদের শিক্ষা আর সামাজিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করছিলেন। এবার সারা ভারতের সকল সম্প্রদায়ের শিক্ষিতা নারীদের সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান 'নিখিল ভারত নারী সম্মেলন' (All India Women's Conference বা A.I.W.C)[৬১] বিভিন্ন প্রদেশে তার শাখা বিস্তার করে, স্থানীয় নারী-প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে যোগস্থাপন করল। কংগ্রেসের নারী-কর্মীরাও বিশেষভাবে পল্লী-নারীদের মধ্যে অনেক গঠনমূলক কাজ করে, তাঁদের মনে স্বদেশপ্রেম ও একতাবোধ জাগিয়ে তুলেছিলেন। কিন্তু সরকারের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি সর্বদা তাঁদের উপর থাকাতে তাঁদের কাজে পদে পদে বাধার সৃষ্টি হত। A.I.W.C-ই ছিল দেশের নারী-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান ও সবচেয়ে প্রভাবশালী।

বাংলাদেশে যাঁরা একাজে অগ্রণী ছিলেন, তাঁদের কয়েকজনকে ভাল করে জানতাম। তাঁরা সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিতা, এবং অনেকে 'বিলাতফেরৎ' মহিলা। বিলাতি কায়দাকানুন সবই তাঁদের জানা ছিল, কিন্তু সে সব ছিল তাঁদের নিতান্তই বাহিরের জিনিস—মনেপ্রাণে তাঁরা বাঙালীই ছিলেন। বিলাতের মেয়েদের কতগুলি সদ্‌গুণ তাঁদের ভাল লেগেছিল, সেগুলিই তাঁরা নিজেদের এবং দেশের মেয়েদের মধ্যে সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন। এ বিষয়ে সরলা রায় বলতেন, 'আমি চাই যে, আমাদের মেয়েরা ঘরে-বাইরে সমান কাজের মেয়ে হবে—তারা "স্মার্ট" হবে, "মডার্ন" হবে, কিন্তু বাঙালী মেয়েই থাকবে। নকল মেমসাহেব তারা হবে না।' নকল মেমসাহেবদের কৃত্রিম মিহি সুর, বিকৃত উচ্চারণ আর বিচিত্র অঙ্গভঙ্গির এমন চমৎকার নকল করে তিনি দেখিয়েছিলেন যে এখনও মনে করলেই হাসি পায়!

বিলাতের মোহ একদল মেয়ের মনে প্রবল থাকলেও, সাধারণভাবে এখন দেশের মেয়েদের মনে দেশের প্রতি টানই প্রবল হয়ে উঠল। 'দেশ' বলতে তাঁরা শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা ভারতকেই বুঝলেন। যখন ছাত্রী ছিলাম, সহপাঠিনী খৃশ্চান মেয়েদের মধ্যে বিলাতি ভাবটা একটু বেশী দেখেছিলাম; এখন তাঁরা সকলেই দেশী নামে, দেশী পোশাকে, দেশের মেয়ে হলেন। এই বান্ধবীদের মুখে অনেক ইংরাজি গান শুনতাম। সুন্দর কতগুলি ইংরাজি ধর্মসঙ্গীত তাঁদের কাছে আমরা শিখেও নিয়েছিলাম, কিন্তু তাঁদের বাংলা গানগুলি ছিল ইংরাজি সুরে এবং ঠিক ইংরাজির তর্জমার মত ভাষাতে। এখন কোন কোন গির্জাতেও রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ[৬২] উপেন্দ্রকিশোর রায়ের লেখা সঙ্গীত শুনতে পেলাম। একটি খৃশ্চান অনুষ্ঠানে স্তোত্রপাঠের মত সুরে সংস্কৃত ভাষায় যীশু-বন্দনা শুনলাম—

"প্রণমামীশ্বর মনুজম্ সুকুমারীতনুজম্" ইত্যাদি।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকেই বাংলার মেয়েদের কাছে দেশী জিনিসের আদর হয়েছিল। এবার তাঁদের বেশভূষার মধ্যে আরো কিছু নূতন লক্ষণ দেখা গেল। এখন নিজেদের দেশেরই বিভিন্ন প্রদেশের মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করে সকলের মধ্যে একতাবোধ জন্মানোর ফলে, নানা প্রদেশের মেয়েদের বেশভূষার মধ্যে যা কিছু সুন্দর ও সুবিধাজনক মনে হল, তাই তাঁরা আদর করে নিয়ে নিলেন। এতে তাঁদের জামা-জুতায়, শাড়ি পরা ও চুল বাঁধার কায়দায় বেশ একটা জাতীয় বা 'ভারতীয়' ভাব ফুটে উঠল। এমন-কি, বিলাতি ফ্যাশনের অতিভক্ত যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও অনেকে তাঁদের কৃত্রিম 'ধনুক-ভুরু' আঁকা কপালে টিপ পরে আর টিকলি দুলিয়ে, 'বব-ছাঁট' চুলে ঢাকা কানে ঝুমকো ঝুলিয়ে, কিংবা চূড়াবাঁধা বিলাতি খোঁপাতে চিরুনি-কাঁটা বসিয়ে এই 'ইন্ডিয়ান স্টাইল'-রূপ 'লেটেস্ট ফ্যাশন' দেখালেন!

পোশাকে আর প্রসাধনে দেশী কায়দার আদর কিন্তু জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের মেয়েদের মধ্যে বরাবরই দেখেছিলাম। ঠাকুর পরিবারের মেয়েরা অনেকে সাহিত্যে, সঙ্গীতে, শিল্পকলায় তখনকার নারীসমাজে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। পরিবারের কৃষ্টির আবহাওয়াতে তাঁদের শৌখিন রুচি ও সৌন্দর্যবোধ ফুটে উঠেছিল। অনেক সুন্দর সেকেলে ফ্যাশনকে তাঁরা সুন্দরতর আধুনিক রূপ দিয়েছিলেন—মেয়ে-মহলে, সে সব 'ঠাকুরবাড়ির ফ্যাশন' নামে পরিচিত ছিল। তখনকার আধুনিকাদের শাড়ি পরার নূতন রীতি, লোকে যাকে 'ব্রাহ্মিকা ফ্যাশন' বলতো, সেটিও উদ্ভাবন করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী।[৬৩] রাঁচি শহর থেকে একটু দূরে মোরাবাদী পাহাড়ের নীচে, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা বাড়ি ছিল। প্রায়ই তাঁরা সেখানে এসে থাকতেন। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সেখান থেকে আমাদের পাড়ায় বেড়াতে আসতেন। মোটরে কিংবা রিক্‌শাতে নয়—সুন্দর গালার কাজ করা রেশমী ঝালর দেওয়া লাল টুকটুকে একটি তাঞ্জামে চড়ে।

কাব্যে ও সাহিত্যে বাংলার মেয়েদের অনুরাগ তো আগেই প্রকাশ পেয়েছিল, অন্তঃপুরের মধ্যে থেকেও কয়েকজন প্রতিভাশালিনী নারী কবি-যশ লাভ করেছিলেন। এবার নূতন উৎসাহে চারিদিকে নূতন নূতন লেখিকার উদয় হল—কবিতায়, প্রবন্ধে, গল্পে, উপন্যাসে, নূতন প্রতিভার উন্মেষ দেখা গেল। সেইসব নবীনা লেখিকাদের মধ্যে কয়েকজন এখনও নূতন নূতন দানে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করছেন। মেয়েদের জন্য অনেকগুলি নূতন পত্রিকা মেয়েরাই সম্পাদনা ও পরিচালনা করলেন। সবগুলিই যে উৎকৃষ্ট হল তা বলতে পারি না—সবগুলি বেশীদিন স্থায়ীও হয়নি, কিন্তু সেগুলির মধ্য দিয়ে দেশের মেয়েদের মনে নূতন ভাব ও চিন্তাধারার বিকাশ ও গতি বেশ বোঝা গেল। তাঁদের রচনার ভঙ্গি বা স্টাইলের মধ্যে যেমন নূতনত্বের স্বাদ পাওয়া গেল, লেখার বিষয়-বৈচিত্র্যের মধ্যেও তেমনি নানা নূতন দিকে তাঁদের আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া গেল।

উচ্চ-শিক্ষার জন্য কন্যাদের যখন কলকাতায় পাঠালাম, ততদিনে মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেকটা প্রশস্ত হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতে অনেক মেয়ে বিশেষ কৃতিত্ব

দেখাচ্ছেন। আমাদের ছাত্রীজীবনে যেসব জিনিসের অভাব ছিল, কিংবা যার পরিকল্পনা বা সূচনামাত্র দেখেছিলাম—লাইব্রেরী, কমনরুম ও ল্যাবরেটরীর সুব্যবস্থা, খেলাধূলা ও ব্যায়াম শিক্ষার ব্যবস্থা, ইত্যাদি—সেগুলি এখন কাজে পরিণত হয়েছে। নূতন দেখলাম—ইউনিভার্সিটিতে এবং কোন কোন কলেজে সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা। প্রথমে অনেকে সহ-শিক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন, কিন্তু কার্যত দেখা যাচ্ছে যে, মোটের উপর এর ফল ভালই হচ্চে। একসঙ্গে সমানভাবে শিক্ষা এবং সমান ব্যবহার পাবার ফলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সমতা ও সহযোগিতার আবহাওয়াতে একটা সহজ সুস্থ মনোভাব গড়ে উঠছে। কোথাও এর কিছু ব্যতিক্রম দেখলে ছাত্রসমাজের 'জনমত'ই তাকে 'সেন্সর' করছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে 'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন' দেখেছিলাম, দ্বিতীয় দশকের শেষে 'অসহযোগ আন্দোলন' দেখলাম, তৃতীয় দশকের শেষে আরম্ভ হল 'সত্যাগ্রহ আন্দোলন'! এ আন্দোলনেও অনেক নারী যোগ দিলেন। অনেক কষ্ট সহ্য করে পুলিসের লাঠি ও লাঞ্ছনার ভয় অগ্রাহ্য করে তাঁরা কাজে নামলেন। একে একে পুরুষ নেতারা যখন বন্দী হলেন, তখন নারীরাই তাঁদের স্থান পূর্ণ করলেন। তাঁদের মধ্যেও অনেককে কারাবাস করতে হল—এই 'জেলখাটা' তাঁদের কলঙ্কের চিহ্ন না হয়ে ললাটের জয়তিলক হল। সরকারের দমননীতি যখন বিফল হল তখন আপসনিষ্পত্তি করে আন্দোলনের অগ্নিতে ভস্ম চাপা দেওয়া হল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে অশান্তির আগুন ধিকিধিকি জ্বলতেই থাকল। তার উপরে আবার একটার পর একটা বিপদের ঝড় দেশের উপর দিয়ে বয়ে গেল।

প্রথমে, বিহারের সেই সর্বনাশা ভূমিকম্প।[৬৪] পুবে ভাগলপুর থেকে পশ্চিমে ছাপরা-মজঃফরপুর, সমস্ত উত্তর বিহার জুড়ে যেন পলকে প্রলয় ঘটে গেল। গৃহহারা, স্বজনহারা, সর্বহারা মানুষ, দিশাহারা মুহ্যমান হয়ে পড়ে রইল! তবু তারই মধ্যে, যারা প্রাণে বাঁচল তারা অন্যকে বাঁচাল, আহতের সেবা করল, বিপন্নকে উদ্ধার করতে নিজের জীবন বিপন্ন করল। রেল নাই, টেলিগ্রাফ নাই, কত জায়গায় পথঘাটের চিহ্নমাত্র নাই, তবু লোকের মুখে দুঃসংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল—শুনে দেশবাসী প্রথমে স্তম্ভিত হল, পরমুহূর্তেই সাহায্যের জন্য ছুটে গেল। অল্পদিন হল অসুস্থ হয়ে মজঃফরপুর থেকে চলে এসেছি, সেখানে অনেক বন্ধু পেয়েছিলাম—তাঁদের কয়েকজনের মৃত্যুসংবাদ পেলাম। ছোট একটি এরোপ্লেনে করে বাইরে থেকে প্রথম রিলিফ পার্টি যখন মজঃফরপুরে পৌঁছাল, দেখল যে, অমন সুন্দর শহরটি যেন শ্মশান হয়ে গিয়েছে! নদীর ধারে ময়দানের ঘাসের উপর চুন দিয়ে বিরাট অক্ষরে লেখা রয়েছে, 'S.O.S. Earthquake'। এ ছাড়া বাহিরের জগৎকে জানাবার আর কী-ই বা উপায় জেলা-শাসনকর্তাদের হাতে ছিল? নিজেদের কিছু করবারই বা কতটুকু সাধ্য তাঁদের ছিল? আশাপথ চেয়ে ঊর্দ্ধমুখে আকাশের দিকেই তাঁরা তাকিয়ে ছিলেন। চারিদিকেই ঐ একই রকম অবস্থা। পর পর কয়েকটি জেলা একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে। এক অঙ্গে কঠিন আঘাত লাগলে যেমন সারা দেহ কেঁপে ওঠে, তেমনি বিহারের দারুণ দুঃখে সমস্ত দেশবাসী বেদনার্ত হয়ে উঠল। অকাতরে অর্থ, সেবা ও সাহায্য দিয়ে সকলে মিলে সেই ভাঙাকে জোড়া দিতে, ধ্বংসের উপরে নতুন সৃষ্টি গড়তে চেষ্টা আরম্ভ করল।

ওদিকে, ইউরোপে আবার দুর্যোগ ঘনিয়ে এল। তৃতীয় দশকের শেষদিকে আরো ব্যাপকভাবে আরো প্রলয়ঙ্কররূপে দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধ আরম্ভ হল। প্রথমবারের যুদ্ধ তবু দূরে ছিল, এবার একেবারে ভারতের দুয়ারে এসে হানা দিল। আবার দেশজুড়ে অর্থ-সঙ্কট, অন্নসঙ্কট, বস্ত্রসঙ্কট দেখা দিল, এবং সবচেয়ে দুর্ভাগ্য হল বাংলা দেশের। বেশী পুরানোদিনের কথা তো নয়, অনেকেরই সে সব কথা স্পষ্ট মনে আছে। সেই জাপানের আক্রমণে ভীত সর্বস্বান্ত লোকেদের জলপথে, আকাশপথে, দুর্গম অরণ্যপথে, বর্মা থেকে দলে দলে বাংলায় আসা, আবার জাপানী বোমার ভয়ে কলকাতা ছেড়ে দলে দলে লোকের বাহিরে পলায়ন! কলকাতায় সেই বিরাট 'মিলিটারী' ঘাঁটি, সেই 'ব্ল্যাক আউট', 'সাইরেন' আর 'শেলটার'—আর সেই একমুঠো ভাতের জন্য, একটুখানি ফ্যানের জন্য, শত শত হতভাগ্যের হাহাকার—সবই যেন দুঃস্বপ্নের মত মনে হয়।

এই আসন্ন বিপদের সম্মুখীন হবার জন্য দেশের নারীরা অনেকে প্রস্তুত হলেন—নিরাশ্রয়দের আশ্রয় ও নিরন্নদের অন্ন দেবার যত ব্যবস্থা হল তাতে অনেক নারী যোগ দিলেন। 'এ আর পি'তে যোগ দিয়ে অনেকে বিষাক্ত গ্যাস ও বোমার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা, অগ্নিনির্বাপণ, বিপন্নের উদ্ধার, আহতের সেবা ও 'প্রাথমিক সাহায্য' দান ইত্যাদি কাজ শিখলেন। দলে দলে নার্স, শুশ্রূষাকাজে বিশেষ শিক্ষা নিয়ে সৈনিক হাসপাতালে আহত সৈন্যদের সেবাশুশ্রূষা করলেন। অনাথ শিশু ও নারীদের জন্য কেহ আশ্রম খুললেন, কেহ বা 'সমবায় সমিতি' গঠন করে গৃহস্থের অতি প্রয়োজনীয় অথচ সে সময় অত্যন্ত দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য খাদ্য, বস্ত্র ও নিত্যব্যবহার্য নানা জিনিস উচিত মূল্যে সরবরাহ করে জনসাধারণের সংসারযাত্রার সঙ্কট লাঘব করলেন।

এই ভাঙাচোরার মধ্য দিয়ে সমাজব্যবস্থার বেশ কিছু ভাঙাগড়া হয়ে গেল। অবস্থা ক্রমে এমন দাঁড়াল যে, মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়ল—অনেক রক্ষণশীল পরিবারের মেয়েদেরও কিছু উপার্জন করবার চেষ্টা দেখতে হল। বিবাহিতা নারীর চাকরি করার পথে তখন অনেক বাধা ছিল—স্ত্রী চাকরি করলে স্বামীর আত্মাভিমানে আঘাত লাগতো, শ্বশুর-শাশুড়ীও অনেক সময় আপত্তি করতেন, কিন্তু বাধ্য হয়েই তাঁদের সে সব ধারণা ছাড়তে হল। অফিসে, দোকানে, ল্যাবরেটরীতে, নানা নূতন ক্ষেত্রে মেয়েরা কাজে লাগলেন। মেয়েরা উপার্জন করাতে শুধু যে সংসারের কিছু সাশ্রয় হল তা নয়, স্বাবলম্বী হওয়াতে তাঁদের মর্যাদাও কিছু বাড়ল।

প্রায় সব বাপ-মায়ের মনেই ছেলে ও মেয়ের প্রতি সমান ভালবাসা থাকে, কিন্তু কন্যার জন্মের সঙ্গেই কন্যাদায়ের বিভীষিকা অনেক সময়ে পিতামাতার স্বাভাবিক মমতাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতো। উদারভাবাপন্ন অনেক পরিবারে পণপ্রথার চল ছিল না, কিন্তু 'শিক্ষিত' লোকেদের মধ্যেও অনেক সময়ে বরপণ ইত্যাদি নিয়ে দুইপক্ষের মধ্যে এমন অশোভন দর কষাকষি চলতে দেখতাম, যেটা দুইদিকের কর্তাদের পক্ষে যেমন লজ্জাকর, কন্যার পক্ষেও তেমনি অপমানকর। দেখে মনে হত, যেন বিবাহ অনুষ্ঠানে 'বর' এবং 'কন্যা' দুইয়েরই সমান দরকার নাই—যত দায় সবই যেন কন্যার বাবার, বরপক্ষ নিতান্তই দয়া করে তাঁদের মেয়েটিকে উদ্ধার করছেন! উপার্জন করে নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি যার আছে

সে-কন্যাকে নিয়ে আর এতটা হেলাফেলা করা চলল না। বিবাহ ও সংসারধর্ম পালন নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য হলেও সেই তার একমাত্র গতি বলে সকলে মনে করলেন না। কোন মেয়ে স্বেচ্ছায় চিরকুমারী থাকলে সেটা আর সমাজে নিন্দনীয় রইল না। ছেলেমেয়েদের এখন আলাপ-পরিচয় ও মেলামেশা করবার সুযোগ হয়েছে, অনেক সময়ে তারা নিজেরাই নিজেদের জীবনসঙ্গী পছন্দ করে নেবে, সেটা আর আশ্চর্য কি? সাধারণত সেটা আনন্দেরই বিষয় হত ; কিন্তু মানুষের মনের মিল যে-দেবতাটি ঘটিয়ে দেন, তিনি তো ঠিকুজী কোষ্ঠি মিলিয়ে কাজ করেন না! মনের মিলের সঙ্গে যদি জাতের মিল না ঘটতো তবেই হত মুশকিল! এ সমস্যা সমাধানের জন্য অসবর্ণ বিবাহ সমাজে প্রচলিত হয়ে গেল।

সাত বৎসর ধরে যুদ্ধের চাপে দেশবাসীর দুঃখকষ্টের যখন অন্ত রইল না, অসন্তোষ ও আন্দোলন আবার প্রবল হল—বিপ্লবও দেখা দিল। হিংসার করালমূর্তি চোখের সামনে দেখে, দেশের নেতারা অহিংসার পথই দৃঢ়ভাবে ধরে রইলেন। মহাযুদ্ধ শেষ হবার আগেই, এদিকে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য অহিংসা সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। বৃটেন তখন যুদ্ধ করে একেবারে ক্লান্ত, বিশ্বে শান্তির জন্য সকলেই উন্মুখ—শান্তিপূর্ণ উপায়ে, দুই পক্ষের মধ্যে বোঝাপড়া করে ভারতের স্বাধীনতালাভ বিশ্বের সামনে এক নূতন আদর্শ দেখাল। কিন্তু স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গেই তো সশরীরে স্বর্গলাভ হল না—সেই সঙ্গে কঠিন দুঃখও ভোগ করতে হল। প্রকৃত সুখশান্তির পথে এখনও পর্বত-প্রমাণ বাধা সামনে রয়েছে, সে বাধা অতিক্রম করবার প্রাণপণ চেষ্টা সফল হলে তবেই দেশের আসল মুক্তি হবে।

প্রায় চল্লিশ বৎসর ঘোরাঘুরির পর, চাকরির ঘানিগাছ থেকে আমাদেরও মুক্তি হল। এবার স্থায়ীভাবে বাংলা দেশে ফিরে এলাম। সেই থেকে ঘরের কোণেই চুপ করে বসে আছি। আমাদের দিন তো শেষ হয়ে এল, এবার নূতনের পালা—বসে বসে সেই নূতনকেই দেখছি। এই নূতন তো পুরাতন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, সেই একই নারী-প্রগতির ধারা পুরাতন থেকে নূতনের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে। আমাদের জন্মের আগেই যার শুরু হয়েছিল, জীবনভরে যার ক্রমবিবর্তন ও বিকাশ দেখলাম, স্বাধীন ভারতে যার পূর্ণ পরিণতির স্বপ্ন দেখছি।

দেশের ঘোর দুর্দশার দিনে, দেশের নারীরা অবহেলায় দুর্গতির মধ্যে পড়েছিলেন। ইংরাজ ভারতে আসার পরে, নবযুগের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে দেশে নবজাগরণের সূচনা হল—একদল উদারমনা, স্থিরবুদ্ধি, দূরদর্শী মানুষ সেই জ্ঞানবিজ্ঞানের নূতন আলোর মধ্যে জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির পথ দেখতে পেলেন। ক্রমে দেশের নারীদের সামনেও সে নূতন পথে চলবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হল। যাঁরা সেই নূতনের শুধু বাহিরের চাকচিক্যটুকু দেখেই ভুললেন, তাঁরা 'সোনা ফেলে আঁচলে গেরো' বাঁধলেন। আর যাঁরা নূতন ও পুরাতনের মধ্যে শুভ-সমন্বয় করে, দুয়ের মধ্যেই যা-কিছু ভাল তাই নিতে পারলেন, তাঁরাই প্রকৃত প্রগতির পথের সন্ধান পেলেন। সে পথে প্রথম যাঁরা চলেছিলেন, তাঁদের সামনে অনেক বাধাবিঘ্ন এসেছিল। অনেক নিন্দা বিদ্রূপ তাঁদের সইতে হয়েছিল, তবুও নিষ্ঠা ও সাহসের সঙ্গে অগ্রসর হয়ে তাঁরা আমাদের জন্য পথ সুগম করে দিয়ে গেলেন। তাঁদের সুকৃতির ফল আজকের নারী ভোগ করছেন।

স্বাধীন ভারতের স্বাধীন নারী আজ সভ্যজগতের সকল নারীর সঙ্গে সমান মর্যাদায় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন। তাঁরা জ্ঞান বিজ্ঞান সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জন করছেন, দায়িত্বপূর্ণ উচ্চ পদের ভার বহন করছেন, দেশের ও সমাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করছেন, বিদেশেও তাঁরা অনেক সম্মান ও সমাদর লাভ করছেন। দেশের 'সাধারণ মেয়ে'ও আজ শিক্ষার আলোয় নিজেদের জীবনকে উন্নত ও বিকশিত করার সুযোগ পাচ্ছেন। সেই আলোতে নিজের গৃহ-পরিবার আর পরিবেশকে তাঁরা সুন্দর, স্বচ্ছন্দ, আনন্দময় করে তুলছেন। নিজেরা জীবনে যত সুযোগ-সুবিধা পেয়েছেন সন্তানদের আরো বেশী কিছু দিবার আশা রাখছেন। কিন্তু এই আশাভরা উজ্জ্বল, রঙিন ছবিটির অন্য পিঠে যে দুঃখ ও হতাশার কালো ছবি রয়েছে, তার দিকে চোখ বুজে থাকলে তো চলবে না! দেশের নারী আজ পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার পেয়েছেন, সমান দায়িত্ব নিয়েই তাঁদের দেশের, বিশেষ করে শিশু ও নারীসমাজের দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে হবে।

যোগ্যতা ও ক্ষমতা যাঁদের আছে, তাঁরা অনেকেই নিজেদের কার্যক্ষেত্রে নানাভাবে দেশের ও সমাজের কল্যাণ করছেন, কিন্তু সাধারণভাবে দেখতে গেলে, আজকের শিক্ষিতা নারীরা সকলেই কি দেশ ও সমাজের প্রতি নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন রয়েছেন? দেশকে যে তাঁরা ভালবাসেন, দেশবাসীর দুঃখে দুঃখ পান, দেশের যে-কোন বিপদের দিনে তার পরিচয় পাই—দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্পে, বন্যায়, দাঙ্গা-হাঙ্গামায় ব্যাকুল হয়ে তাঁরা আর্ত এবং উদ্বাস্তুর সেবা ও সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে ছোটখাটো ব্যাপারে নিজেদের বিবেচনার অভাব এবং কর্তব্যে অবহেলার দরুন তাঁরা অন্যের দুঃখ বাড়িয়ে তোলেন। স্বদেশী আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে দেশের সাধারণ নারীদের মধ্যেও একটা দৃঢ় আদর্শনিষ্ঠা দেখেছিলাম, স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গেই কি তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল? পরাধীনতার বন্ধন থেকে দেশের মুক্তি হলেও দারিদ্র্য ও দুর্দশার হাত থেকে মুক্তি তো এখনও বহু দূর ; বরং সাধারণ লোকের দুঃখ-কষ্ট দিনে দিনে যেন অসহ্য হয়ে উঠছে! এ দুঃখ তো ভূমিকম্প বা বন্যার মত 'ভগবানের মার' নয়, এ যে প্রধানত মানুষের লোভ, হিংসা ও স্বার্থপরতার সৃষ্টি। এ দানবের সঙ্গে যুদ্ধ করে দেশের নেতা এবং কর্তারাই পরাস্ত-প্রায় হচ্ছেন, সেখানে নারীরা কী করতে পারেন? কতটুকু ক্ষমতা তাঁদের আছে? সাধারণ নারী যদি আর কিছু না-ই পারেন, অন্তত লোকের দুঃখকষ্ট দূর করবার জন্য যে সব চেষ্টা ও ব্যবস্থা হচ্ছে, তাতে সহায়তা করতে পারেন।

বিগত মহাযুদ্ধের পরে, যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত বৃটেনের অর্থনৈতিক সঙ্কট মিটাবার জন্য বৃটিশ গভর্নমেন্টকে দেশের খাদ্য, বস্ত্র ও নানা নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসের সম্বন্ধে কঠোর নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়েছিল। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সে দেশের নারীরা অম্লান-বদনে সে নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে পালন করে কতখানি ধৈর্য, শৃঙ্খলা ও পটুতার সঙ্গে নিজেদের সংসার চালিয়েছিলেন, তা দেখে সে সময়ে যাঁরা বিলাতে গিয়েছিলেন তাঁরা সকলেই মুগ্ধ হয়েছিলেন! আর, আমাদের রেশনের চালের সঙ্গে গম নিতে হলে, কিংবা চিনির পরিমাণ কিছু কম হলে আমরা চোখে অন্ধকার দেখি! গরীব গৃহস্থকে বাঁচাবার জন্য যদি মাছ বা তেলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়, অমনি সে সব জিনিস বাজার থেকে উড়ে যায়—

কিন্তু, গোপনে দ্বিগুণ বা চতুর্গুণ মূল্যে ধনী গৃহিণীর গৃহে পৌঁছে যায়! এমনি করেই 'কালোবাজার', 'চোরাবাজার' প্রশ্রয় পায়। দেশের নারীরা ব্যক্তিগতভাবে এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করলে কি এ সব দুর্নীতি কিছুটা নিবারণ করাও সম্ভব হয় না?

আজ আমাদের খাদ্যে ভেজাল, পানীয়ে ভেজাল, ঔষধে ভেজাল—জাতীয় চরিত্রের মধ্যেই যেন ভেজাল মিশেছে, তাই চারিদিকে দুর্নীতি সদর্পে মাথা তুলে জাতির ভবিষ্যৎকে অন্ধকার করতে পারছে! এই বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে, আজকের নারীকে আরো সজাগ এবং তৎপর হতে হবে। নিজেদের সুখসৌভাগ্যের মধ্যে নিশ্চিন্ত আরামে মগ্ন থাকলে চলবে না—বঞ্চিত দুর্ভাগ্যদের সে সৌভাগ্যে অংশ দিয়ে, সৌভাগ্যের ঋণ শোধ করতে হবে। জীবনসংগ্রামে শ্রান্ত হয়ে অবসাদভরে হাল ছেড়ে দিলেও চলবে না—প্রাণপণ শক্তি দিয়ে দুর্ভাগ্যকে জয় করে, ভবিষ্যৎ সন্তানদের সে দুঃখ থেকে বাঁচাতে হবে। ভবিষ্যৎ জাতিকে গড়ে তোলার ভার প্রধানত নারীদের হাতে—যদি তাঁদের সন্তানদের খাঁটি মানুষ করে গড়তে পারেন তবেই জাতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল এবং নিরাপদ হবে ; আজকের নারীরা যদি সমান দায়িত্ব বহন করে পূর্ণভাবে নিজেদের কর্তব্য পালন করতে পারেন, তবেই তাঁদের প্রগতি সার্থক এবং সফল হবে।

রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩০ অগাস্ট, ১৯৬৪

পরিশিষ্ট

আমার মা পুণ্যলতা চক্রবর্তী

১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯, তাঁর জন্মের পর একশ বছর পূর্ণ হল। বহুমুখী প্রতিভাধর উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর তিনি তৃতীয় সন্তান। সুখলতা রাও আর সুকুমার রায়ের ছোটবোন, আমাদের মা পুণ্যলতা, নিজেও ছোটদের জন্যে চমৎকার লিখতেন, তবে তিনি কম লিখেছেন, বেশিরভাগই শেষ বয়সে। পুণ্যলতা ছিলেন বেথুন কলেজের কৃতী ছাত্রী। বিবাহিত জীবনের প্রায় সবটাই কেটেছিল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট স্বামী অরুণনাথ চক্রবর্তীর কর্মক্ষেত্রে, বিহারের ছোট ছোট শহরে। সার্থক ছিল তাঁর ডাকনাম খুশি! যেখানেই যেতেন, তিনি সেখানকার সঙ্গে খাপ খাইয়ে অপূর্ব আনন্দময় পরিবেশ গড়ে তুলতে পারতেন।

আমরা দুটি বোন, কাকা-কাকিমা খুব অল্পবয়সে মারা গেলে তাঁদের তিনটি ছেলেমেয়ে, এই পাঁচজনকে নিয়ে মা সুখের সংসার রচনা করেছিলেন। আমাদের অবিবাহিতা পিসিমা শৈলবালা আর মার সব ছোটভাই অকৃতদার সুবিমল প্রতিটি ছুটিতে আমাদের বাড়ি আসতেন। ধনদাদু (কুলদারঞ্জন রায়) ও তাঁর দুই মেয়ে, বড়মামিমা ও তাঁর ছেলে মানিক (সত্যজিৎ) বছরে একবার অন্তত আসতেন। তাছাড়া ছোড়দাদুর (প্রমদারঞ্জন) ছেলেমেয়েরা আর অন্যান্য আত্মীয়স্বজন মিলে ছুটিতে বাড়ি গমগম করত। এ বিষয়ে বাবারও খুব উৎসাহ ছিল, বলতেন 'The more the merrier।' খেলাধুলো, গানবাজনা, বেড়ানো, বনভোজন খাওয়াদাওয়া—ছুটিগুলো যেন স্বপ্নের মত কেটে যেত। আমাদের বাড়িটা ছিল সবার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ছুটি কাটাবার জায়গা।

অন্য সময়েও আনন্দ কিছু কম হত না। আমাদের কলেজে পড়া শহুরে মা আশ্চর্য সহজভাবে সেই মফস্বলের পড়াশুনো না-করা মেয়েদের সঙ্গে মিশতেন, ওঁদের সংসারের কাজে ও শিশুপালনে সাহায্য করতেন। একটু বড় ছেলেমেয়েরা হত আমাদের খেলার ও বেড়াবার সঙ্গী।

আমাদের আর এইসব ছেলেমেয়েকে নিয়ে মা দুর্ভিক্ষ বা বন্যাত্রাণ উপলক্ষে কত যে নাটক, ট্যাবলো প্রভৃতি অভিনয় করিয়ে টাকা তুলেছেন তার ঠিক নেই—লক্ষ্মীর পরীক্ষা, ধ্রুবর খেলা, সাত ভাই চম্পা, স্লিপিং বিউটি, আরও কত কি! মা একাই শেখাতেন, সাজাতেন, আবার নাটক খুঁজে না পেলে নিজেই লিখে দিতেন।

মা চমৎকার রাঁধতে পারতেন, কেবল দেশী-বিলেতী প্রচলিত রান্নাই নয়, মন থেকে উদ্ভাবন করা নানারকম নতুন লোভনীয় খাবার তৈরি করতেন। যে কোনও কারণে-অকারণে আমাদের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া লেগেই থাকত।

আমরা নিয়মমাফিক সঙ্গীতচর্চা করিনি কখনও, কিন্তু মা নিজে হারমোনিয়ম বাজিয়ে আমাদের অনেক ব্রহ্মসঙ্গীত, জাতীয় সঙ্গীত আর সুন্দর সুন্দর গান শিখিয়েছিলেন। ছোটবেলা থেকে আমাদের পড়াশুনোর দিকে ছিল মার বিশেষ দৃষ্টি। পাঠ্যবই থেকে নীরস যান্ত্রিক শিক্ষা পাইনি। ছোটবেলায় ভাল ভাল বই থেকে গল্প বলে মা আমাদের রুচি তৈরি করে দিয়েছিলেন। আশ্চর্য সরস ও সজীব ছিল তাঁর বলার ধরন। নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা আর মনগড়া কাহিনীও অনেক বলতেন। একটু বড় হতেই আমাদের ভাল বই পড়তে

আর স্বাধীনভাবে শিখতে উৎসাহ দিতেন। বিহারে তখন ছোট শহরে ভাল লাইব্রেরি ছিল না। প্রতি মাসে কলকাতা থেকে আমাদের জন্য ইংরেজি-বাংলা নতুন বই আর পত্রিকা আনাতেন।

অন্যান্য বিষয়ে শেখানোর পদ্ধতিও ছিল অভিনব। বাগানে বীজ পুঁতে, গাছ লাগিয়ে আমাদের প্রকৃতিপাঠ হত। বনেজঙ্গলে বেড়াবার সময়ে গাছপালা, পশুপাখিপোকা পর্যবেক্ষণ করতাম। মাটির পাহাড় তৈরি করে, তার ওপর থেকে ঝরনা বইয়ে, তারপর সেই নদীর গতিপ্রকৃতি দেখে প্রাকৃতিক ভূগোল শিখতাম। ছোটদের ইতিহাস-ভূগোল বা বিজ্ঞানের পাঠ্যবইগুলি মার পছন্দ হত না—খাতায় নিজের ভাষায় লিখে, উপযুক্ত ম্যাপ ও ছবি এঁকে এবং কেটে-জুড়ে বই তৈরি করে দিতেন। সেই আশ্চর্য সরস-সহজ লেখা যদি রেখে দিতাম তাহলে সেটা আজও আদর্শ ছোটদের পাঠ্যপুস্তক বলা যেতে পারত। তেমনি আদর্শ আধুনিক ছিল মার শেখাবার পদ্ধতি।

লেখাপড়ার পাশাপাশি মা আমাদের রান্না, সেলাই, বোনা আর নানারকম ঘরের কাজ শেখাতেন। নিজে তিনি আশ্চর্য সুন্দর ডিজাইন উদ্ভাবন করতেন, অনেক সময়ে না এঁকেই সেগুলি কাপড়ে তুলতেন, একটুও বাঁকা হত না।

অনেকদিন বিহারে থেকে মা বাংলা শিশুসাহিত্যের আবহাওয়া থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তবু 'সন্দেশে' কিছু কিছু লিখতেন। বড়মামা (সুকুমার রায়) অকালে মারা যাবার পরে মা 'সন্দেশে' অনেকগুলো গল্প সুন্দর সরস ভাষায় লিখেছিলেন। আর লিখেছিলেন সহজ সরস প্রবন্ধ, 'গাছপালার কথা'।

আমরা যেমন ছোটবেলায় মার কাছে গল্প শুনতে ভালবাসতাম, তেমনি আমাদের ছেলেদের কাছে প্রিয় ছিল দিদার ছোটবেলার গল্প। ওদের সে সব বলতে গিয়েই লেখা হয়েছিল মার অনবদ্য স্মৃতিকথা 'ছেলেবেলার দিনগুলি'।

১৯৬১ সালে যখন 'সন্দেশ' আবার প্রকাশিত হল, মা উৎসাহের সঙ্গে তার ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। অনেক গল্প লিখেছিলেন 'সন্দেশে', 'দাদুর গল্প' নাম দিয়ে বাবার কর্মজীবনের মজার অভিজ্ঞতার অনেক কথা সরস ভাষায় লিখেছিলেন।

মার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টি হল তাঁর শেষ বয়সে লেখা 'সন্দেশে' প্রকাশিত ছোট্ট গল্পগুলি—পরে যা 'ছোট্ট ছোট্ট গল্প' নাম দিয়ে তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত হয়েছিল। অল্প কয়েক লাইনে শেষ, অথচ তার মধ্যেই নিটোল সুন্দর গল্প একেবারে ছোট শিশুর মনের মতন করে পরিবেশিত হয়েছে। 'ছোট্ট ছোট্ট গল্প' বাংলা সাহিত্যে একটি অতুলনীয় সৃষ্টি বললেও অত্যুক্তি হয় না।

১৯৭৪ সালের ২১ নভেম্বর ৮৫ বছর বয়সে পুণ্যলতা চক্রবর্তী আকাশের তারা হয়ে যান।

আজকাল, ১০.৯.১৯৮৯ নলিনী দাশ

সাহিত্যিকা সংবর্ধনা

পুণ্যলতা চক্রবর্ত্তীর গল্পগুলি ইদানীং "সন্দেশ" পত্রিকায় যতই পড়েছি ততই ভালো লেগেছে। যত সোজাই মনে হক, ছোটদের জন্যে ছোট্ট নিটোল গল্প লেখা মোটেই সোজা নয়। বিশেষ কঠিন হল ছোটদের জন্যে লেখা হচ্ছে এই কথাটি ভুলে যাওয়া। বেশি মনে রেখে লিখতে গেলে গল্প স্বাদ হারায়, বেশি ভুলে গেলে সে আর ছোটদের গল্প থাকে না। পুণ্যলতা চক্রবর্ত্তীর লেখায় সেই বিশেষ গুণটি আছে, সেই অনাবিল প্রসন্নতা, যা পড়লেই মন ভরে ওঠে। পুস্তকাকারে এখনো অপ্রকাশিত এই গল্পগুলির কথা বিশেষ করে বলতে হল এইজন্যে যে পুণ্যলতা চক্রবর্ত্তীর প্রকাশিত বই এখনো মাত্র একটি, "ছেলেবেলার দিনগুলি"। আমরা চাই, যে তাঁর অন্য গল্পগুলিও যথাশীঘ্র সম্ভব পুস্তকাকারে প্রকাশিত হক।

কেন পুণ্যলতা চক্রবর্ত্তী আরো অনেক লেখেননি, অনেক আগেই ছোটদের বই বের করেননি ভেবে অবাক হচ্ছিলাম। তারপরই আমাদের সামনে এলেন পুণ্যলতা চক্রবর্ত্তী। ওঁর রাসবিহারী অ্যাভিনিউর বাড়িতে বসে আলাপ করলাম আমরা। তিরাশীতে পৌঁছেও ঋজু, সপ্রতিভ, শোভন, সদালাপী, পুণ্যলতাকে দেখে আমরা খুবই বিস্মিত হই সন্দেহ নেই। ওঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে যেন ওঁর অনেকটাই জানা হয়ে গেল, অনেক প্রশ্নের উত্তর যেন পেলাম আমরা। উপেন্দ্রকিশোরের তৃতীয় সন্তান পুণ্যলতা চক্রবর্ত্তী। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পরিবার সম্পর্কে বাংলাভাষার পাঠক পাঠিকার কাছে নতুন কথা বলার কি আছে। সেই পরিবারের উদার সংস্কৃতি ও শিক্ষার প্রাণবন্ত পরিবেশে বড় হয়ে পুণ্যলতা চক্রবর্ত্তী যদি এমন বিদুষী, শিল্পী, লেখিকা, সীবন শিল্পে নিপুণা না হতেন, তা হলেই যেন আশ্চর্য কথা হত। সুকুমার রায়, সুখলতা রাও, এঁদের নাম যত পরিচিত, পুণ্যলতা চক্রবর্ত্তীর নাম যে তত পরিচিত নয়, তার অন্যতম কারণ হল এই লেখিকার সহজাত সঙ্কোচ, প্রচার-বিমুখতা ও ব্যক্তিগত জীবনের সম্পূর্ণতা। স্বামীর সঙ্গে তাঁর কর্মক্ষেত্রে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। সেই সময়, মেয়েদের পড়াবার জন্যে হাতে পাহাড়, জঙ্গল, আগ্নেয়গিরির মডেল গড়েছেন। স্ব-উদ্ভাবিত প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে ভূগোল শিক্ষা দিয়েছেন, যে পদ্ধতি আজ আধুনিক বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হয়। এইভাবেই পড়িয়েছেন বিজ্ঞান, ইতিহাস, ইংরেজি, বাংলা। নাতিদের কাছে ছোটবেলার গল্পগুলি রেখে যাবার জন্য যা লিখতেন, তাই "ছেলেবেলার দিনগুলি" নামে বেরিয়েছে। আজ যে ছোট ছোট গল্পগুলি "সন্দেশ" কাগজে বেরোয়, সেগুলির অধিকাংশই স্নেহাস্পদদের মনোরঞ্জনের জন্য লেখা। উদার ও শোভন ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী পুণ্যলতা চক্রবর্ত্তী অনেক বিলম্বে শিশু সাহিত্য ক্ষেত্রে এলেও, মূল্যবান কিছু রেখে যাবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।

মহাশ্বেতা দেবী

[দ *সাহিত্যিকা সংবর্ধনা*। য়ুনিভার্সিটি উইমেনস্ এ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত। রবীন্দ্র সদন, ১০ই অগ্রহায়ণ ১৩৭৯/২৬শে নভেম্বর ১৯৭২। সভাস্থলে বিনামূল্যে বিতরিত পুস্তিকা। পৃ. [3]-[4]।]

অনুষঙ্গ

অধ্যায় ১ : একাল যখন শুরু হল

১ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৮৬৩-১৯১৫) : বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক, শিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। পাঁচ বছর বয়সে হরিকিশোর দত্তক নেওয়ার পর তাঁর নাম কামদারঞ্জন রায় থেকে পরিবর্তন করে উপেন্দ্রকিশোর রাখা হয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন এবং বিধুমুখী দেবীকে বিয়ে করেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে *সখা*-য় তাঁর প্রথম লেখা প্রকাশিত হয়। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ছোটোদের জন্য *সন্দেশ* পত্রিকা প্রকাশ করেন। ভারতবর্ষে উচ্চশ্রেণীর ছবি তৈরি ও মুদ্রণে তিনি পথপ্রদর্শক ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইউ রায় অ্যান্ড সন্স প্রতিষ্ঠান থেকেই এদেশে প্রসেস-শিল্প বিকাশের সূত্রপাত হয়।

২ উপেন্দ্রকিশোরের বড়দাদা সারদারঞ্জন রায়, ভাই মুক্তিদারঞ্জন এবং দিদি গিরিবালা (নন্দীচৌধুরী) হিন্দু ছিলেন। ছোটো দুই ভাই কুলদারঞ্জন এবং প্রমদারঞ্জন ব্রাহ্ম হন। ছোটো-বোন মৃণালিনী ব্রাহ্ম হেমেন্দ্রমোহন বসুকে বিয়ে করে ব্রাহ্ম হন।

৩ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৪-৯৮) : নারীকল্যাণ-ব্রতী এবং বিখ্যাত সমাজসংস্কারক ছিলেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরিদপুরে *অবলাবান্ধব* পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় ও ছাত্রীনিবাস প্রতিষ্ঠায় প্রধান উদ্যোগী এবং এটি উঠে গেলে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। মহিলাদের বিভিন্ন অধিকার বিষয়ে আন্দোলন করেন। আসামের চা-শ্রমিকদের আন্দোলনের পরিচালক। তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল *বীর নারী* (নাটক), *কবিগাথা, সুরুচির কুটির, জীবনালেখ্য, নববার্ষিকী,* ইত্যাদি।

৪ কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৬১/২-১৯২৩) : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণা প্রথম মহিলা। তাঁর জন্যই বেথুন স্কুলে এফ এ এবং পরে বি এ ক্লাস খোলা হয়। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এবং চন্দ্রমুখী বসু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম দুই মহিলা গ্র্যাজুয়েট। ১৮৮৪-তে তিনি এদেশের মেডিক্যাল কলেজের প্রথম মহিলা ছাত্রী। বিদেশ থেকে তিনি ডিগ্রী নিয়ে এসে এদেশে ডাক্তারি শুরু করেন। তিনি জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম নারী-বক্তা। তিনি মহিলাদের অবস্থান নিয়ে নানা সময়ে নানা স্থানে কাজ করেছেন। জ্যোতির্ময়ী এবং প্রভাতচন্দ্র এঁর অন্যতম দুই সন্তান।

৫ 'বড়দিদিমার (মার পিসিমার) ঘরে ঢোকাও আমাদের বারণ ছিল। সেখানে কিন্তু ভয়ের কিছুই ছিল না বরং লোভের অনেক কিছু ছিল। পাছে আমরা জুতো পায়ে কিংবা নোংরা হাতে বড়দিদিমার পুজোর জিনিস নষ্ট করে ফেলি সেই জন্য তিনি না ডাকলে তাঁর ঘরে ঢোকা মানা। বড়দিদিমা যখন পুজোয় বসতেন, তখন আমি আর আমার প্রিয় সাথী চামী-মাসি রোজ দরজার গোড়ায় বসে দেখতাম। গঙ্গামাটি দিয়ে শিব গড়া, মন্ত্র পড়া, ঘণ্টা নাড়া, ফুল-চন্দন-বেলপাতা দেওয়া, কোশাকুশি করে গঙ্গাজল ঢালা, সবই চমৎকার লাগত, কিন্তু যেই বড়দিদিমা ববম্ বম্ করে গাল বাজাতেন, অমনি ভয়ানক হাসি পেত। মা বলেছিলেন হাসতে নেই, তাই দু'জনে ছুটে লম্বা বারান্দার অন্যদিকে পালিয়ে গিয়ে একচোট হেসে নিয়ে আবার শান্ত হয়ে বসতাম। স্নান করে পুজো সেরে, বড়দিদিমা খেতে বসতেন। আমরা দু'জনে প্রসাদ

পেতাম। পাথরের বাটিতে ঘনদুধ ও কলা দিয়ে ভাত মাখতেন, পায়েসের মতো খেতে সেই সুগন্ধি চালের দুধভাতের উপর আমাদের ভারি লোভ ছিল। আর লোভ ছিল আমসত্ত্বের। বড়দিদিমা প্রতিবৎসর কাশী থেকে ক্যানেস্তারা ভর্তি আমসত্ত্ব তৈরি করে আনতেন। বড় বড় থালার মতো গোল আমসত্ত্ব, চাটাইয়ের মতো দাগকাটা চৌকোনো আমসত্ত্ব, সুন্দর ছাঁচে ঢালা ফুলকাটা আমসত্ত্ব। আমাদের সবাইকে ভাগ করে দিতেন। বড়দিদিমার জন্য 'ভারী' রোজ গঙ্গাজল দিয়ে যেত।'

[সূত্র : পুণ্যলতা চক্রবর্তী, *ছেলেবেলার দিনগুলি*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৭, পৃ. ১৪।]

৬ জয়তারা দেবী।

৭ *জামাই বারিক* (১৮৭২)। দীনবন্ধু মিত্রের হাস্যরসাত্মক নাটকটি সংলাপ ও চরিত্রসৃষ্টির জন্য বহু প্রশংসিত। এর কিছু অংশ সম্ভবত সত্য ঘটনা থেকে নেওয়া।

৮ বিধুমুখী দেবী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম পক্ষের একমাত্র কন্যাসন্তান। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীকে বিয়ে করেন। সুখলতা, সুকুমার, পুণ্যলতা, সুবিনয়, শান্তিলতা ও সুবিমল এঁর ছয় কৃতী সন্তান।

৯ সুখলতা (খুসী), সুকুমার (তাতা), পুণ্যলতা (হাসি), সুবিনয় (মণি), শান্তিলতা (টুনি) ও সুবিমল (নানকু) উপেন্দ্রকিশোর ও বিধুমুখীর ছয় কৃতী সন্তান।

'নিজেদের ছটি ছেলেমেয়ে, সুরমা, বিধুমুখীর রুগ্ন ছোট ভাই সতীশচন্দ্র, উপেন্দ্রকিশোরের চতুর্থ ভাই কুলদারঞ্জন এঁরা তো ছিলেনই, তা ছাড়া আরো বহু আত্মীয়বন্ধুর যাওয়া আসা লেগেই থাকত।'

[সূত্র : লীলা মজুমদার, 'উপেন্দ্রকিশোর', *লীলা মজুমদার রচনাবলী*, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা, মার্চ ১৯৮৩, পৃ. ১৬১।]

১০ ফিটন হল একটি বা জোড়া ঘোড়ায় টানা ঊনবিংশ শতাব্দীর হাল্কা গাড়ি। খুব বড়ো বড়ো চাকাওয়ালা এই গাড়িগুলো খুব তাড়াতাড়ি চালানো যেত। গ্রীক পুরাণে বর্ণিত সূর্যের সন্তান ফিটন-এর (Phaeton) নাম থেকেই এই গাড়ির নামকরণ।

১১ ল্যান্ডো হল একরকম হাল্কা ছাদ-খোলা ঘোড়ার গাড়ি যার তলায় থাকে উপবৃত্তাকার স্প্রিং। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ল্যান্ডো (Landau) শহরে তৈরি হয় এই গাড়ি। ওই শহরের নাম থেকেই এর নামকরণ হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এটির চেহারা পূর্ণতা অর্জন করে। এই শহুরে বিলাসবহুল গাড়ির আরোহীদের সাজপোশাক খুব স্পষ্টভাবে রাস্তার মানুষ দেখতে পারে যে কারণে আজও নানা অনুষ্ঠানে এই গাড়ি জনপ্রিয়।

অধ্যায় ২ : স্কুল-কলেজ

১২ ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় : ১৬ মে, ১৮৯০ তারিখে ১৩ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসুর উদ্যোগে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে মাত্র পনেরোজন ছাত্রী নিয়ে স্কুলটি খোলা হয়। শুরু হওয়ার সময়ে ছাত্রীদের মাসিক বেতন ছিল ২ টাকা। ১৮৯৩ সালে স্কুলটিতে একটি হস্টেল খোলা হয়। ১৯০৩ সালে স্থানান্তরিত হয়ে স্কুলটি আপার সার্কুলার রোডের (এ. পি. সি. রোড) বর্তমান ভবনে উঠে আসে।

১৩ ১৬০৪ সালে ইংরেজ মহিলা মেরি ওয়ার্ড, ইন্সটিটিউট অব্ ব্লেস্‌ড ভার্জিন মেরি স্থাপন করেন। এখানকার সন্ন্যাসিনীরা লরেটো সিস্টারস্ নামে পরিচিত হন। এঁদের প্রধান উদ্দেশ্য

ছিল সমসাময়িক প্রয়োজন অনুযায়ী অল্পবয়স্ক মেয়ে ও মহিলাদের চার্চের তত্ত্বাবধানে শিক্ষিত করা। ১৮৪১ সালে ডেলফিন হার্টের পরিচালনায় একদল লরেটো সিস্টার কলকাতায় আসেন। ১৮৪২ সালের জানুয়ারিতে তাঁরা ৭নং মিডলটন রো-তে যে জমি পান সেখানে ভারতবর্ষের প্রথম লরেটো হাউস স্কুল স্থাপন করেন। ৬০/৭০ জন ছাত্রী নিয়ে সন্ন্যাসিনীদের আবাসেই এর ক্লাস শুরু হয়। এর মধ্যে বেশিরভাগ ছাত্রীরা বাড়ি থেকে যাতায়াত করলেও কয়েকজন আবাসিক ছাত্রীও ছিল। লরেটো হাউস এডুকেশনাল সোসাইটি অব্ ক্যালকাটা এখন এই স্কুলটি চালনা করেন। এঁদের তত্ত্বাবধানে এই দেশে পরে অনেকগুলি লরেটো স্কুল স্থাপিত হয়।

১৪ উপেন্দ্রকিশোরের প্রথম সন্তান শিশুসাহিত্যিক সুখলতা (১৮৮৬-১৯৬৯)। খুব ভালো চিত্রশিল্পীও ছিলেন। ছোটোদের জন্য নানা ভাষায় প্রাইমার লিখেছেন। ১৯০১-এ তিনি ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় থেকে এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে বেথুন কলেজের ফার্স্ট আর্টস ক্লাসে ভর্তি হন। ১৯০৭-এ ওড়িশার ভক্তকবি মধুসূদন রাও-এর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে তিনি বিয়ে করেন। *গল্প আর গল্প, আলিভুলির দেশে, নানান দেশের রূপকথা* ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত বই। তিনটি খণ্ডে তাঁর যাবতীয় বাংলা রচনা সম্প্রতি সংকলিত হয়েছে।

১৫ খুব সম্ভবত সুরমা-র কথাই এখানে বলা হচ্ছে। রামকুমার বিদ্যারত্ন সন্ন্যাসী হয়ে গেলে তাঁর একমাত্র মাতৃহীনা কন্যাটিকে উপেন্দ্রকিশোর ও বিধুমুখী সস্নেহে পালন করেন এবং পরে এঁর সঙ্গে উপেন্দ্রকিশোরের ছোটভাই প্রমদারঞ্জনের বিয়ে হয়। প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক লীলা মজুমদার এঁদের কৃতী সন্তান।

১৬ বেথুন কলেজ : ১৮৭৯ সালে মাত্র একজন ছাত্রী, কাদম্বিনী বসু-কে (পরবর্তীকালে কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়) নিয়ে কলেজটির সূচনা। ১৮৮৩ সালে কাদম্বিনী ও চন্দ্রমুখী বসু এই কলেজ থেকে প্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার জন্য মনোনীত হন। ১৮৮৮ সাল থেকে এই কলেজে স্নাতক ডিগ্রী দেওয়া শুরু হয়। বেথুন কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন চন্দ্রমুখী বসু।

১৭ পুণ্যলতার ছোটো বোন শান্তিলতার জন্ম হয় ১৪ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯ (১৮৯২) সালে। *সন্দেশ* পত্রিকায় তাঁর কয়েকটি সুন্দর কবিতা ও গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। প্রভাত চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৯১৯ সালে অতি অল্প বয়সে তিনি মারা যান।

১৮ বেথুন স্কুল : ১৮৪৯ সালের ৭মে জন এলিয়েট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন কলকাতায় হিন্দু মেয়েদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্রথমে তিনি এর নামকরণ করেন 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল'। রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় স্কুলের জমি প্রদান করেন। পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও রামগোপাল ঘোষ ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তাদের অন্যতম। মাত্র একুশজন ছাত্রী নিয়ে দক্ষিণারঞ্জনের মীর্জাপুরের বাড়িতে স্কুলটি শুরু হয়। ১৮৫০ সালে স্কুলের নতুন শিল্যান্যাস হয় এবং প্রতিষ্ঠানটি কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটে স্থানান্তরিত হয়।

১৯ চন্দ্রমুখী বসু (১৮৬০-১৯৪৪) : দেরাদুন প্রবাসী খ্রীষ্টান পরিবারের কন্যা, যিনি ১৮৮৮-তে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম দুই মহিলা গ্র্যাজুয়েটের একজন। ১৮৮৪-তে তিনি একা ইংরিজিতে অনার্স নিয়ে এম এ পাশ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এম এ পাশ মহিলা। ১৮৮৬ সাল থেকে তিনি বেথুন কলেজে অধ্যাপনা করেন এবং পরে এর অধ্যক্ষা হন। ইনি রসরাজ অমৃতলাল বসুর সম্পর্কিত বোন ও পণ্ডিত কেশবানন্দ মমগায়েনের স্ত্রী ছিলেন। চন্দ্রমুখীর প্রয়াণের পরে *প্রবাসী* পত্রিকার চৈত্র ১৩৫০ সংখ্যায় তাঁর জীবন-বিষয়ে যে ছোট

লেখনটি প্রকাশিত হয় নীচে সেটি দেওয়া হল :

পরলোকে চন্দ্রমুখী বসু

চন্দ্রমুখী বসু ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই লেখাপড়ার দিকে তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল। তিনি দেরাদুন হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। পরে কলিকাতায় আসিয়া বি-এ ও এম-এ অধ্যয়ন করেন। তিনি ভারতের প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁহাকে সেক্সপীয়রের গ্রন্থাবলী উপহার প্রদান করেন। তিনি কলিকাতার বীটন কলেজের প্রথম ভারতীয় মহিলা প্রিন্সিপাল। বঙ্গের স্ত্রী-শিক্ষা-প্রচেষ্টার ইতিহাসে চন্দ্রমুখী বসুর নাম স্মরণীয়। তিনি পাদ্রী ভুবনমোহন বসুর কন্যা।

২০

বাঙালীর মেয়ে

কে যায় কে যায় অই উঁকিঝুঁকি চেয়ে?
হাতে বালা, পায়ে মল, কাঁকালেতে গোট,
তাম্বুলে তামাকু রস—রাঙা রাঙা ঠোঁট,
কপালে টিপের ফোঁটা, খোঁপা বাঁধা চুল,
কসেতে রসনা ভরা—গালে ভরা গুল,
বলিহারি কিবা সাটী দুকূলে বাহার,
কালাপেড়ে শান্তিপুরে, কল্মে চুড়িদার,
অহঙ্কারে ফেটে পড়ে, চলে যেন ধেয়ে—
হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে

হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে—
মুখের সাপটে দড়, বিপদে অজ্ঞান,
কোঁদলে ঝড়ের আগে, কথায় তুফান,
বেহদ্দ সুখের সাধ—পা ছড়ায়ে বসা,
আঁচলের খুঁট্টি তুলে অমঙ্গলা ঘষা!

নমস্কার তাঁর পায়—পাড়ায় বেড়ানী
পেট্টিভরা কঁজ্‌ড়ো কথা, পরনিন্দা গ্লানি,
কথায় আকাশে তোলে, হাতে দেয় চাঁদ,
যার খায়, যার পরে, তারি নিন্দাবাদ,
রসনা কলের গাড়ী চলে রাত্রি দিন,
ঘাড়েতে পড়েন যার—বিপদ সঙ্গিন,
খেয়ে যান্, নিয়ে যান্, আর যান্ চেয়ে—
হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে!

হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে–
ধারাপাতে মূর্ত্তিমান, চারুপাঠ পড়া,
পেটের ভিতরে গজে দাসুরায়ী ছড়া!
চিত্রিকাজে চিত্রিগুপ্ত–পীঁড়িতে আল্‌পানা,
হদ্দ বাহাদুরি-"ছিরি", বিচিত্র কারখানা!
অঙ্কশাস্ত্রে–বররুচি, গ্যালিলো নিউটান,
গণ্ডা কড়ি গুন্তে হ'লে জানের বাড়ী যান;
পাত্তেড়ে পড়োর মত অক্ষরের ছাঁদ,
কলাপাতে না এগুতে গ্রন্থ লেখা সাধ!
ক্ষীরপুলি, পায়েস, পীঠা, মিষ্টান্নের সীমা,
বলিহারি বঙ্গনারী তোমার মহিমা!
জলো দুধে পুষ্টদেহ তেলে জলে নেয়ে–
হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে!

হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে–
সুমুখে দুধের কড়া–কাটীতে ঘোটন,
খোলা চুলে চুলো জ্বেলে ধোঁয়াতে ক্রন্দন!
তপ্ত ভাতে ভরা হাঁড়ী বেড়ী ধরে তোলা,
মদ্‌গুর মৎস্যের ঝোলে ধনে বাঁটা গোলা,
খাড়া বড়ী শাক্ পাতারে বিলক্ষণ টান্,
কালিয়ে কাবাব্ রেঁদে দেমাকে অজ্ঞান!

শাঁখেতে পাড়িতে ফুঁক চূড়ান্ত নিপুণ,
হুলুধ্বনি কোলাহলে চতুর্ম্মুখ খুন!
রান্নাঘরে হাওয়া খাওয়া, গাড়ী মুদে যাওয়া
দেশশুদ্ধ লোকের মাঝে গঙ্গাঘাটে নাওয়া!
বাসর ঘরে ঝুমুর কবি চখের মাথা খেয়ে,
প্রভাত হ'লে পিস্‌শাশুড়ী ঘোম্‌টা মুখে চেয়ে–

সাবাস্ সাবাস্ তোরে বাঙালীর মেয়ে!
ব্রতকথা, উপকথা, সেঁজুতি পালন,
কালীঘাটে যেতে পেলে স্বর্গে আরোহণ!
মেয়ে ছেলের বিয়ে পর্ব্বে গাজনের গোল,
যাত্রা সঙে নিদ্রাত্যাগ–ছেলে ভরা কোল,
ভূত পেরেতে দিনে ভয়, অন্ধকারে কাঠ,
শক্ত রোগে রোজা [ডাক]া, স্বস্ত্যয়ন পাঠ,
তীর্থস্থানে পা পড়িলে আহ্লাদে পুঁতুল,
হাট বাজারে লজ্জাহীনা, ঘরে কুঁড়িফুল!
গুঁড়িকাষ্ঠ, নুড়িশিলা, ভক্তিপথে নেয়ে–
হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে!

হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে—
রসের মরাল যেন জলটুকু ছেড়ে
দুধটুকু টেনে ন্যান আগে গিয়া তেড়ে,
চিনের পুতুলে সাধ, বাক্স টিনে পেটা!
"র‍্যাফেল" বাঁধা ছবিগুলি ঘরে দোরে সাঁটা!
খেলায় দিগ্‌গজ কেঁয়ে, চোরের সদ্দার,
লুকোচুরি যমের বাড়ী—স্পষ্ট করে ধার!
আয়েস খালি খোঁপা বাঁধা, নয় বিননো ঝারা,
হদ্দ হলো কচি ছেলে টেনে এনে মারা!
কার্পেটে কারচুপি কাজ কারু নব্য চাল,
ঘরকন্নায় জলাঞ্জলি ভাত রাঁধতে ডাল!
নিজে ঘাটে, অন্যে দোষে, মুক্‌সাপটে দড়,
হুজ্জুতে হারিলে কেঁদে পাড়া করে জড় ;
বাঙালী মেয়ের গুণ কে ফুরাবে গেয়ে—
হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে!

হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে—
মৃদু মৃদু হাসিটুকু অধরে রঞ্জন,
সাবাস সাবাস নাক চোখের গড়ন ;
কালো চুলে কিবা ঘটা, চোখে কাল তারা,
দেখে নাই যারা কভু দেখে যাক্ তারা!
ভাসা ভাসা খাসা চোখ তুলি দিয়ে আঁকা,
তা উপরি কিবা সরু ভুরুযুগ বাঁকা!
থমকে থমকে থির গতি কি সুন্দর,
হাসি হাসি মুখখানি কিবা মনোহর!
আহা আহা লজ্জা যেন গায়ে ফুটে আছে—
কোথা লজ্জাবতী তুই এ লতার কাছে?
চক্ষু যদি থাকে কারো তবে দেখ চেয়ে—
হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে!

[দ্র. *হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী*, আর্য্য-সাহিত্য-সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৩০০ বঙ্গাব্দ, পৃ ৩১-৩৫ (বিবিধ কবিতা)।]

২১ পুণ্যলতার উদ্ধৃতিতে ভুল আছে, মূল কবিতাটি নীচে দেওয়া হল :

(১)
কে বলেরে বাঙ্গালীর জীবন অসার?
সৌরভে আমোদ দেখ্ আজ্ কিবা তার!
বাঙ্গালীর হৃদয়ের যতনের ধন,
তার মাঝে দেখ অই দুইটী রতন

রজনী করিতে ভোর উজলি গগন
আশার আকাশে উঠি জ্বলিছে কেমন!—
ধন্য বঙ্গনারী ধন্য সাবাসি তুহারে।
ভাসিল আনন্দ ভেলা কালের জুয়ারে!
(২)
কি ফুল ফুটিল আজি বঙ্গের মরুতে
ফোটে কিরে হেন ফুল কোন সে তরুতে?
কোন্ নদী কোন্ হ্রদ পাহাড় উপরে
ফুটন্ত কুসুম হেন আনন্দ বিতরে?
রে যামিনি, তারা হারা, কিবা আভরণ
আছে বল্ তোর বুকে দেখিতে এমন?
এত দিনে বুঝিলাম সে নহে স্বপন,
ভারত-বিপিনে বীজ হয়েছে বপন॥—
ধন্য বঙ্গনারী ধন্য সাবাসি তুহারে!
ভাসিল আনন্দ ভেলা কালের জুয়ারে!
(৩)
এত দিনে জাগিল রে জীবনে বিশ্বাস,
ঘুচিল হৃদয়ে হ'তে কালের হতাশ॥
বাঙ্গালীর কামিনীর হৃদয় কমলে
পাশ্চাত্য সাহিত্য-রূপ দিনমণি জ্বলে॥
সমপাঠে সহযোগী কুরঙ্গ-নয়নী,
ছুটেছে যুবক সঙ্গে যুবতী রমণী॥
পরেছে উপাধি হার—সুনীল বসন
সেজেছে অঙ্গেতে কিবা চারু-দরশন!—
ধন্য বঙ্গনারী ধন্য সাবাসি তুহারে।
ভাসিল আনন্দ ভেলা কালের জুয়ারে!
(৪)
কবে দেখিব বল্ এ বিপিন মাঝে,
আর(ও) হেন কুরঙ্গিণী এ মোহন সাজে!
সে দিন হবে কি ফিরে এ দেশে আবার
নারী হবে পুরুষের জীবন আধার!
গৃহরূপ কমলের কমলা আকারে,
ছড়াইবে সুখ রাশি চাহিয়া সবারে
হবে কি সে দিন, ফিরে যবে এ কাঙালী
অলকা পাইবে হাতে অভাগা কাঙালী!—
কি আশা জাগালি হৃদে, কে আর নিবারে?
ধন্য বঙ্গনারী ধন্য সাবাসি তুহারে!

(৫)
হরিণ নয়না শুন কাদম্বিনী বালা,
শুনো ওগো চন্দ্রমুখী কৌমুদীর মালা,
তোমাদের অগ্রপাঠী আমি একজন,
অই বেশ, ও উপাধি করেছি ধারণ।
যে ধিক্কারে লিখিয়াছি "বাঙালীর মেয়ে",
তারি মত সুখ আজ তোমা দোঁহে পেয়ে॥
বেঁচে থাক, সুখে থাক, চির সুখে আর!
কে বলেরে বাঙ্গালীর জীবন অসার।—
কি আশা জাগালি হৃদে কে আর নিবারে?
ভাসিল আনন্দ ভেলা কালের জুয়ারে॥
ধন্য বঙ্গনারী ধন্য সাবাসি তুহারে।

[দ্র. 'বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গরমণীর উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে', *হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী*, আর্য্য-সাহিত্য-সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩০০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৫-৬৬ (জয়মঙ্গলগীতি)।]

২২. ক্যাম্পবেল হাসপাতাল : ১ জুলাই, ১৮৬৭-তে শিয়ালদহে দরিদ্র-ভিখারীদের জন্য ক্যাম্পবেল হাসপাতালের উদ্বোধন করে জাস্টিসেস্ অফ পিস, ক্যালকাটা (অধুনা কলকাতা পৌরসংস্থা-র পূর্বসূরী)। ১৮৭৩ সালের নভেম্বর মাসে কলিকাতার উপকণ্ঠ শিয়ালদহে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের যোগ্যতাপ্রাপ্ত বেঙ্গল ক্লাসকে নতুন-নির্মিত ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলে নিয়ে আসা হয়। লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল-এর নামে এই কলেজের নামকরণ করা হয়। সেই বছর ডিসেম্বর মাসে হাসপাতালটি ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলের সঙ্গে সংযুক্ত হাসপাতাল বলে সরকারের কাছে হস্তান্তরিত করা হয়। ১৯০৮-১০ সালে হাসপাতালটি সম্পূর্ণ নতুনভাবে পুনর্নির্মিত হয়। পরবর্তীকালে এটির নাম হয় নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল।

[সূত্র : *মেডিসিন অ্যান্ড দ্য রাজ, ব্রিটিশ মেডিক্যাল পলিসি ইন ইন্ডিয়া*, ১৮৩৫-১৯১১, অনিল কুমার, সেজ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৮, নয়া দিল্লি]।

২৩ হেমপ্রভা বসু ছিলেন ভগবানচন্দ্র বসুর কনিষ্ঠা কন্যা এবং আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর ছোটো বোন। ১৮৯৮-তে তিনি এম এ পাশ করেন। প্রথমে বেথুন স্কুল, পরে বেথুন কলেজের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। তিনি কোনোদিন বিয়ে করেননি এবং আমৃত্যু বেথুন হস্টেলে থাকতেন।

২৪ জন এলিয়ট ড্রিংকওয়াটার বেথুন-এর মৃত্যুদিন ১২ আগস্ট, ১৮৫১। এই দিনটিকেই বেথুন দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

২৫ সরলা দেবী চৌধুরাণী (১৮৭২-১৯৪৫) ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী ও জানকীনাথ ঘোষালের কন্যা। ১৩০২-১৩০৪ জ্যেষ্ঠা ভগিনী হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে যুগ্মভাবে এবং ১৩০৬-১৩১৪ অবধি এককভাবে *ভারতী* পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৯০৫-এ বিয়ে করেন পঞ্জাবের বিখ্যাত আইনজ্ঞ, জাতীয়তাবাদী নেতা ও সমাজসংস্কারক পণ্ডিত রামভুজ দত্ত চৌধুরীকে। ১৯০৭-এ স্বামীর সহযোগিতায় লাহোর থেকে উর্দু পত্রিকা *হিন্দুস্থান* প্রকাশ করেন। অনেক গান রচনা করেন এবং সুর দেন। বন্দেমাতরম্-এ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুর দেন। জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩০-এ ভারত-স্ত্রী শিক্ষাসদন প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই *শতগান, গীত-ত্রিংশতি, জীবনের ঝরাপাতা* (আত্মজীবনী) ইত্যাদি।

সম্প্রতি তাঁর একটি প্রবন্ধ-সংকলন প্রকাশিত হয়েছে এবং *জীবনের ঝরাপাতা*-র একটি নতুন সংস্করণ বেরিয়েছে।

২৬ হিরণ্ময়ী দেবী (১৮৭০-১৯২৫) ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী ও জানকীনাথ ঘোষালের প্রথমা কন্যা। ১৮৮৩ সালে অধ্যাপক ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ১২ বছর বয়স থেকে তিনি *সখা* পত্রিকায় কবিতা লেখা শুরু করেন। কনিষ্ঠা ভগিনী সরলা দেবীর সঙ্গে কিছুকাল *ভারতী* পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তিনি 'সখী সমিতির' নেত্রী ছিলেন। ১৯০৬ সালে তিনি হিরণ্ময়ী বিধবা আশ্রম খোলেন।

২৭ ভগিনী নিবেদিতা (১৮৬৭-১৯১১) : জন্মসূত্রে আইরিশ। ১৮৯৫-তে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হন। ১৮৯৮-তে বিবেকানন্দের আহ্বানে ভারতবর্ষে আসেন। এই বছরেই বিবেকানন্দ তাঁর মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল নামটি বদলে নাম করেন ভগিনী নিবেদিতা। ১৮৯৮-তে তিনি বাগবাজার বোসপাড়ায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন (যার এখনকার নাম নিবেদিতা বিদ্যালয়)। বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে একপ্রকার সম্পর্ক ত্যাগ করে ভারতের মুক্তি আন্দোলনে যোগ দেন। জাতীয় কংগ্রেসের চরম ও নরমপন্থীদের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি দার্জিলিং-এ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও লেডী অবলা বসুর সঙ্গে থাকাকালীন দেহত্যাগ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই হল : *The Master as I Saw Him, The Web of Indian Life, Hints on National Education, Aggressive Hinduism, Notes on Some Wanderings with Swami Vivekananda* ইত্যাদি।

২৮ কর্নেলিয়া সোরাবজি (১৮৬৬-১৯৫৫) : ভারতের প্রথম মহিলা আইনজীবীদের একজন। মা ছিলেন টোডা উপজাতির এবং পিতা পার্সি থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রীষ্টান হন। তিনি নিজে সারাজীবন অবিবাহিত ছিলেন। ১৮৯২-তে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনিই প্রথম মহিলা যিনি ব্যাচেলর অব সিভিল ল ডিগ্রি পান। ১৯০৪-এ তিনি ব্রিটিশ সরকারের কোর্ট অব ওয়র্ডস-এর আইনি পরামর্শদাত্রীর পদে যোগ দেন। পরবর্তী তিরিশ বছর ধরে তিনি সহায়সম্বলহীনা মহিলাদের অধিকারের জন্য লড়াই করেছেন। ছাপান্ন বছর বয়সে তিনি ব্যারিস্টার হওয়ার স্বীকৃতি পান এবং কলিকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন। আজীবন ব্রিটিশ শাসনের সমর্থক কর্নেলিয়া ১৯৩৮-এ বিলেতে চলে যান এবং জীবনের শেষ বছরগুলি ওদেশেই কাটান। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই হল : *Love and Life Behind the Purdah* (১৯০১), *India Calling* (১৯৩৪) ইত্যাদি। সম্প্রতি তাঁর একটি প্রামাণ্য জীবনী প্রকাশিত হয়েছে [দ্র. Suparna Gooptu : *Cornelia Sorabji : India's Pioneer Woman Lawyer. A Biography,* New Delhi, OUP, 2006]।

অধ্যায় ৩ : ঘরে-বাইরে

২৯ ১৮৪৫-৫৫-তে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ প্রচলনের প্রস্তাব করেন। ১৮৫৬-তে বিধবাবিবাহ আইন পাশ হয়। ওই বছর ডিসেম্বর মাসে প্রথম বিধবাবিবাহ করেন শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অনেক বিধবার বিয়ে দেন এবং নিজের ছেলে নারায়ণচন্দ্র-র বিধবাবিবাহ অনুমোদন করেন।

অধ্যায় ৪ : বঙ্গভঙ্গ

৩০ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে অবস্থিত রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের বিপরীতদিকের উদ্যান। (বর্তমান নাম সাধনা সরকার মহিলা উদ্যান)। এই উদ্যানে শুধুমাত্র মহিলারাই প্রবেশ করতে পারেন।

৩১ স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫) : ১৮৬৯-এ বিলেত থেকে আই সি এস পরীক্ষা পাশ করেন। পরে মেট্রোপোলিটন কলেজ, সিটি কলেজ ও ফ্রি চার্চ কলেজে পড়ান। ১৮৮২-তে রিপন কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন (এখন যার নাম সুরেন্দ্রনাথ কলেজ)। তিনি বাংলার নিয়মতান্ত্রিক ও আবেদন-নিবেদনমূলক রাজনীতির প্রধান পুরোধা। ১৮৭৬-এ আনন্দমোহন বসুর সঙ্গে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের নেতা। সে সময়ে ওঁকে বলা হত surrender-not Surendranath। ১৯১২-তে বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়াতে unsettling a settled fact-এর জন্য তিনি বিখ্যাত হয়ে যান। ১৯১২-এ মন্ত্রী হন এবং ১৯২৩-এ বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে হেরে রাজনীতি থেকে অবসর নেন। ওঁর বিখ্যাত বই *A Nation in the Making*।

৩২ বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৬৮-১৯৩২) : ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের চরমপন্থী নেতা হিসেবে স্বীকৃত। ১৮৭৭ সালে তিনি হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে ব্রাহ্ম হন এবং ১৮৯৫-তে দীক্ষা নিয়ে বৈষ্ণব হন। কটক, শ্রীহট্ট, ব্যাঙ্গালোর ও কলকাতার নানা স্কুলে পড়ান। ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেন। ১৯০৬-এ *বন্দেমাতরম্* পত্রিকার সম্পাদক। ১৯০৮-এ বিলাতে গিয়ে *Swaraj* এবং *Indian Student* পত্রিকার সম্পাদনা করেন। ১৯১৬-তে তিলকের হোম রুল লিগের সদস্য হন। ১৯২১-এ রাজনীতি থেকে অবসর নেন। ওঁর বিখ্যাত বই *ভারত সীমান্তে রুশ, নব যুগের বাংলা, জেলের খাতা, Indian Nationalism, Swaraj and the Present Situation, Memoirs of My Life and Time* ইত্যাদি।

৩৩ ১৬ অক্টোবর, ১৯০৫।

৩৩ক. অখণ্ড বঙ্গভবন : '১৬ই অক্টোবর ১৯০৫—বঙ্গভঙ্গের জন্য নির্দিষ্ট দিনে গঙ্গাস্নান সেরে রাখী-বন্ধনের ডাক দিয়ে দেশপ্রেমের গান গেয়ে শহর পরিক্রমা করে একটি মিছিল। এই মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। "বাংলার মাটি বাংলার জল" গাইতে গাইতে মিছিলটি সুকিয়া স্ট্রিটে প্রবেশ করলে, উপেন্দ্রকিশোর দোতলা থেকে নেমে এসে বেহালা বাজাতে বাজাতে মিছিলে যোগ দিলেন। সেদিন বিকেল তিনটের সময় "অখণ্ড বঙ্গ-ভবন"-এর ভিত্তিস্থাপনা হল ২৯৪ নম্বর আপার সার্কুলার রোডে। জায়গাটি উপেন্দ্রকিশোরের বাড়ির থেকে একটু দূরে। এই উপলক্ষে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। অসুস্থ আনন্দমোহন বসু ছিলেন সেই সভার সভাপতি। তাঁকে ইনভ্যালিড চেয়ারে করে সভায় আনা হল। অতি কষ্টে তিনি ভাষণের সামান্য অংশ পড়লেন। বাকিটা পড়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। উপেন্দ্রকিশোরের পরিবারের সবাই ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের নব-নির্মিত-ভবনের ছাত থেকে এই ঐতিহাসিক সভা দেখলেন।'

[সূত্র : হেমন্তকুমার আঢ্য : 'উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী : জীবনী', *কোরক সাহিত্য পত্রিকা,* উপেন্দ্রকিশোর সংখ্যা, বইমেলা ২০০৫, কলকাতা।]

৩৪ আনন্দমোহন বসু (১৮৪৭-১৯০৬) : ১৮৭৪-এ কেমব্রিজ থেকে গণিতের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রথম ভারতীয় র‍্যাঙলার ও ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফেরেন। এর আগেই তিনি

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বোন স্বর্ণপ্রভাকে বিয়ে করেন। ১৮৬৯-এ তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন এবং ১৮৭৮-এ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। সমাজের ভবন, সিটি স্কুল ও কলেজ স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা নেন। ১৮৭৫-এ স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন গঠন করেন ও তার সভাপতি হন। ১৮৭৯-তে প্রতিষ্ঠা করেন ছাত্রসমাজ। ১৮৭৬-এ স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৬-এ বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৮২-তে শিক্ষা কমিশনের সদস্য হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও সেনেটের সদস্য ছিলেন। ১৯০৫-এ অসুস্থ অবস্থায়ও অখণ্ড বঙ্গদেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে ফেডারেশন হলের সভায় সভাপতিত্ব করেন।

৩৫ স্বর্ণকুমারী দেবী (আঃ ১৮৫৫-১৯৩২) : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যা। ১৮৬৭-তে জানকীনাথ ঘোষালের সঙ্গে বিয়ে হয়। ১২৯১-১৩০১ ও ১৩১৫-১৩২১ অবধি *ভারতী* পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১২৯৩ বঙ্গাব্দে অনাথা ও বিধবাদের জন্য সখী-সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯২৭-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখিকা হিসেবে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক পান। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই হল *দীপ-নির্ব্বাণ, কাহাকে?, পাকচক্র, বিদ্রোহ* ইত্যাদি। ইদানীংকালে তাঁর রচনার একাধিক সংকলন প্রকাশিত হয়েছে।

অধ্যায় ৫ : প্রবাসে

৩৬ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩) : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র। তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি আই সি এস পরীক্ষা পাশ করেন। ১৮৫৯-এ তিনি ব্রাহ্মসমাজের কর্মকর্তা এবং *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-র সম্পাদক হন। ১৮৬৭ সালে তিনি হিন্দুমেলা প্রবর্তন করেন। ১৮৬৯ সালে তিনি জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে বিয়ে করেন। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁদের দুই কৃতী সন্তান। সত্যেন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য বই হল *স্ত্রী স্বাধীনতা, ভারতবর্ষীয় ইংরাজ, সুশীলা ও বীরসিংহ* (নাটক), *আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস, বোম্বাই-চিত্র* ইত্যাদি।

৩৭ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫) : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঞ্চম পুত্র। তিনি ছিলেন সঞ্জীবনীসভার একজন উদ্যোক্তা এবং *ভারতী* পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি খুব সক্রিয় ছিলেন। ১৯০২-১৯০৩ তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি ছিলেন। তাঁর সাহিত্যকর্ম বহু-বিস্তৃত। *অলীকবাবু, পুরুবিক্রম, সরোজিনী, স্বপ্নময়ী, কিঞ্চিৎ জলযোগ, হঠাৎ নবাব* ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য বই। সঙ্গীত ও চিত্রাঙ্কনেও তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। অনেক গান তিনি রচনা করেছিলেন। ফরাসি ভাষা থেকে অসংখ্য অনুবাদও তাঁর অন্যতম কীর্তি। তিনি আকারমাত্রিক স্বরলিপির উদ্ভাবক। তিনি কাদম্বরী দেবীকে বিয়ে করেন।

৩৮ প্রমথনাথ বসু (১৮৫৫-১৯৩৫) : প্রখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ্। তিনি কিছুদিন প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯০৩-০৪ নাগাদ তিনি ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের গুরুমহিষানি অঞ্চলে লৌহখানি আবিষ্কার করেন। পরে তিনিই জামশেদজি টাটাকে লৌহ-ইস্পাত কারখানা স্থাপনে রাজী করান। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা নেন। বাংলায় বিজ্ঞান প্রচারেও তিনি একজন অগ্রণী ছিলেন। বিলাতে তিনি ইন্ডিয়া সোসাইটির কর্মসচিব ছিলেন, পরে

বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটের অধ্যক্ষ হন। তিনি বেঙ্গল অ্যাকাডেমী অফ লিটারেচার স্থাপন করেন (পরে এটি সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে যোগ হয়ে যায়)। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটিরও সদস্য ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই হল *A History of Hindu Civilization under British Rule, Swaraj–Cultural and Political* ইত্যাদি।

৩৯ এই বইয়ের টীকা ২১-এর মতো এখানেও লেখিকার উদ্ধৃতিতে কিছুটা ভুল আছে। উদ্ধৃতিটি "সামান্য ক্ষতি" কবিতার একটি অংশ।

কলকল্লোলে লাজ দিল আজ
নারী কণ্ঠের কাকলি।
মৃণালভুজের ললিত বিলাসে
চঞ্চলা নদী মাতে উল্লাসে,
আলাপে প্রলাপে হাসি-উচ্ছ্বাসে
আকাশ উঠিল আকুলি।

"সামান্য ক্ষতি" কবিতাটি *কথা* কাব্যসংকলনের অন্তর্গত। কবিতাটির রচনাকাল ২৫ আশ্বিন, ১৩০৬। [দ্র. *রবীন্দ্র রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ পৌষ ১৪০২, পৃ. ৪১-৪৪।]

৪০ অরুণনাথ ও পুণ্যলতা চক্রবর্তীর দুই সন্তান হলেন কল্যাণী ও নলিনী। কল্যাণী কার্লেকার (১৯১১-২০০২) ছিলেন বিশিষ্ট সমাজ সেবিকা। ১৯৭২-৭৩ সালে তিনি তাঁর সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান 'ক্যালকাটা সোশ্যাল প্রজেক্ট' প্রতিষ্ঠা করেন। বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। গোবিন্দ বিষ্ণু কার্লেকরের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। হিরণ্ময়, রণজয় ও অভিজয় তাঁর তিন পুত্র। অধ্যাপক রণজয় কার্লেকর ১৯৮৩-তে প্রয়াত হন।

নলিনী দাশ (১৯১৬-৯৩) ছিলেন ভিক্টোরিয়া ইন্‌স্টিটিউশন ও পরে বেথুন কলেজের অধ্যাপক। বি এ-তে প্রথম হয়ে তিনি ঈশান স্কলার হন। বহুদিন তিনি *সন্দেশ* পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। *গোয়েন্দা গণ্ডালু, রা-কা-যে-টে-না-পা, হাস্য ও রহস্যের গল্প* ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত বই। কবি জীবনানন্দ দাশের ভাই অশোকানন্দ দাশকে তিনি বিয়ে করেন। অমিতানন্দ দাশ এঁদের একমাত্র সন্তান।

৪১ রাসসুন্দরী দেবী (১৮০৯-৯৯) : মাত্র ১২ বছর বয়সে বিয়ে হয় অক্ষরপরিচয়হীন এই মহিলার। পঁচিশ বছর বয়সে ইনি পুত্রের সঙ্গে পড়তে শেখেন। পঞ্চাশ বছরে লিখতে শিখে ঊনষাট বছর বয়সে লেখেন বঙ্গসাহিত্যে মহিলা-লিখিত প্রথম আত্মজীবনীগ্রন্থ *আমার জীবন* (১৮৬৮)।

অধ্যায় ৭ : বাহির দুয়ার

৪২ হিরণ্ময়ী বিধবা আশ্রম ১৯০৬ সালে হিরণ্ময়ী দেবী প্রতিষ্ঠা করেন। স্বর্ণকুমারী দেবী প্রতিষ্ঠিত সখী-সমিতির লুপ্ত অবস্থা পুনরুজ্জীবিত করতে নিজের অর্থ দিয়ে এই শিল্পাশ্রমটি তিনি তৈরি করেন।

৪৩ ১৩১৯ কার্তিক সংখ্যা *মহিলা*-তে কৃষ্ণভাবিনী দাস লিখেছিলেন :
প্রায় ৪ বৎসর হইল শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরানী ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল নামক একটি নারী

সমিতি স্থাপন করেন। ভারতবর্ষের সকল ধর্ম্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের নারীদিগের একত্র আনয়ন করিয়া শিক্ষা দ্বারা তাঁহাদের নৈতিক, মানসিক ও অবস্থাগত উন্নতি সাধন করা এই সমিতির উদ্দেশ্য। ...ভারতবর্ষীয় স্ত্রীদিগের দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যসকল বিক্রয়ের সুবিধার জন্য স্থানে স্থানে পুরনারী নির্ব্বাহ ভাণ্ডার নামে ডিপো খোলা হইয়াছে। ঐরূপে নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত স্ত্রীদিগের দ্রব্যাদি বিক্রয়ের সুবিধা হইলে উহার দ্বারা অনেক দরিদ্র পরিবারের ভরণপোষণের সুবিধা হইবে। ...এই কয়েক বৎসরের মধ্যে ইহার শাখা লাহোর, করাচী, হায়দরাবাদ (সিন্ধু), এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, কলিকাতা, হাজারিবাগ, মেদিনীপুর, প্রভৃতি স্থানে খোলা হইয়াছে। ...প্রায় দুই বৎসর হইল কলিকাতায় ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের শাখা স্থাপিত হইয়া স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। ...কলিকাতার শাখা সমিতিতে প্রায় ৬০০ জন মেম্বার হইয়াছেন। জাতি, ধর্ম্ম ও শ্রেণী নির্ব্বিশেষে যে কোন স্ত্রীলোক...ইহার মেম্বার হইতে পারেন।'

৪৪ কৃষ্ণভাবিনী দাস (১৮৬৪-১৯১৯) : মাত্র নয় বছর বয়সে বহুবাজারের প্রসিদ্ধ শ্রীনাথ দাসের পুত্র দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে এঁর বিয়ে হয়। বিয়ের পরে স্বামীর উৎসাহে পড়াশোনা করেন। একমাত্র সন্তান একটি ছয় বছরের কন্যাকে রেখে চৌদ্দ বছরের জন্য বিলেত যান। ১৮৮৫-তে ছদ্মনামে লেখেন *ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা*। স্ত্রী স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর মতামতের জন্য বইটি অল্পদিনের মধ্যেই নিষিদ্ধ হয়। ১৯০৯-এ স্বামী ও একমাত্র সন্তানের মৃত্যুর পর তিনি ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের সেবাকাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯১৬-তে তিনি একটি বিধবা আশ্রম স্থাপন করেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকা সত্ত্বেও তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর বহু লেখা *ভারতী, সখা, প্রবাসী, প্রদীপ,* ইত্যাদি পত্রিকাতে ছড়িয়ে আছে। সম্প্রতি তাঁর একটি প্রবন্ধসংকলন প্রকাশিত হয়েছে।

৪৫ দেবেন্দ্রনাথ দাস (১২৬৩-১৩১৫ বঙ্গাব্দ) ছিলেন বহুভাষাবিদ্। বিলেতে গিয়ে সিভিল সার্ভিস পাশ করলেও বয়সের কারণে কাজ পাননি, উপরন্তু বিলেতযাত্রার জন্য ত্যাজ্যপুত্র হন। ১৮৭৩ নাগাদ কৃষ্ণভাবিনী সর্বাধিকারীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ১৮৮২-তে সস্ত্রীক বিলেতে ফেরত যান। সেখানে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের জন্য ভাষাশিক্ষার স্কুল খোলেন। ১৮৯১-তে দেশে ফিরে রিপন কলেজে অধ্যাপনা করেন। পরে সেঞ্চুরী কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর আত্মজীবনীর নাম *পাগলের কথা*।

তিলোত্তমা দাসী (১৮৭৬-১৯০৯) ছিলেন কৃষ্ণভাবিনী দাস ও দেবেন্দ্রনাথের একমাত্র সন্তান যাঁকে ছয় বছর বয়সে তাঁর পিতামহর কাছে রেখে পিতামাতা ১৮৮২-তে বিলেতে যান। ১৪ বছর পরে দেশে ফিরে অপাত্রে পড়েছেন বলে কৃষ্ণভাবিনী তাঁকে স্বামীত্যাগ করে সমাজকল্যাণে ব্রতী হতে উপদেশ দেন। কিন্তু তিলোত্তমার সংস্কারাচ্ছন্ন মন তা মেনে নিতে পারেনি। ১৯০৯-এ মাত্র বাইশ দিনের ব্যবধানে দেবেন্দ্রনাথ ও তিলোত্তমার মৃত্যু হয়। এর পর কৃষ্ণভাবিনী মোটা খদ্দরের শাড়ি পরে খালি পায়ে কলিকাতার পথে পথে ঘুরে পর্দানশীন মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহ দেন এবং সমাজকল্যাণ কাজে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন। তিলোত্তমা দাসীর লেখা কাব্যপুস্তকের নাম *আক্ষেপ*।

৪৬ ১৯১৯-এর ১৪ এপ্রিল মুরলীধর গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় লেডী অবলা বসুর উৎসাহে ও আনুকূল্যে স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮/১ নং ফার্ণ রোডে মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাগানবাড়িতে কয়েকজন মাত্র ছাত্রী নিয়ে এর প্রাথমিক বিভাগ শুরু হয়। ১৯৪০-এ তাঁর মৃত্যুর পর স্কুলটি বালিগঞ্জ গার্লস্ কলেজ নামে পরিবর্ধিত হয়। ১৯৪৬-এ মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণে এটির নামকরণ হয়

মুরলীধর গার্লস কলেজ। গড়িয়াহাট রোডে স্কুল ও কলেজটির নিজস্ব ভবন তার পরে তৈরি হয়।

৪৭ ১৯২০-র ২ জুলাই বেলতলা রোডে অখিলবন্ধু গুহর ছোটো বাড়িতে জনাকয়েক ছাত্রী নিয়ে বেলতলা বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্যারীমোহন চট্টোপাধ্যায়। রাস্তার নাম থেকেই বিদ্যালয়ের নামকরণ হয়। পরে কলিকাতা কর্পোরেশন ২০/১ শ্যামানন্দ রোডে জমিসহ বাড়িটি দান করে। বিদ্যালয়ের প্রথম সভাপতি ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। খুব সম্ভবত তাঁর স্ত্রী বাসন্তী দেবী স্কুলভবনটি তৈরি করতে বিশেষ সচেষ্ট হন।

৪৮ বিদ্যাসাগর বাণীভবন ১৯২৫-এ প্রতিষ্ঠা করেন লেডী অবলা বসু। তাঁর চেষ্টায় বাংলার গ্রামগঞ্জে প্রায় শ দুয়েক মতো বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। এই কাজে শিক্ষয়িত্রীর অভাব পূরণ করতে বিধবা ছাত্রীদের জন্য এই প্রতিষ্ঠান খোলা হয়। ১৯৩৫-এ লেডী অবলা বসু প্রতিষ্ঠা করেন বিদ্যাসাগর ট্রেনিং স্কুল।

৪৯ লেডী অবলা বসু (১৮৬৪-১৯৫১) ছিলেন দুর্গামোহন দাসের কনিষ্ঠা কন্যা ও সরলা রায়ের বোন। স্ত্রী শিক্ষা প্রসার ও বিধবা নারীদের অর্থকরী শিক্ষাদানের জন্য তিনি ১৯১৯-এ নারী শিক্ষা সমিতি গঠন করেন। এ কাজে প্রধান শিক্ষক কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক তাঁর বিশেষ সহযোগী ছিলেন। তাঁরই চেষ্টায় পরবর্তীকালে গ্রামেগঞ্জে প্রায় দুশো বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। ১৯২৫-এ তিনি বিদ্যাসাগর বাণীভবন, ১৯২৫-এ মহিলা শিল্পভবন এবং ১৯৩৫-এ বাণীভবন ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

৫০ প্রসন্নকুমার রায় (১৮৪৯-১৯৩২) : ডক্টর পি কে রায় নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। কেশবচন্দ্রের কাছে দীক্ষা নিয়ে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করাতে ত্যাজ্যপুত্র হন। আনন্দমোহন বসুর সহযোগিতায় তিনি বিলেতে ব্রাহ্মসমাজ, 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি' ও একটি পুস্তকালয় খোলেন। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ হন (১৯০২-০৫)। দু বছরের জন্য তিনি ভারত সচিবের শিক্ষা বিষয়ের পরামর্শদাতা হয়ে ইংল্যান্ড যান। তিনি কিছুদিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতিও ছিলেন। সমাজসেবী সরলা দেবীকে [রায়] তিনি বিয়ে করেন।

৫১ সরলা রায় (১৮৬১-১৯৪৬) এবং কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম মহিলা যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি পান। কিন্তু মাত্র ষোলো বছর বয়সেই অধ্যাপক প্রসন্নকুমার রায়ের সঙ্গে সরলার বিয়ে হয়ে যাওয়াতে তিনি আর সেই অধিকারকে কার্যকরী করে তুলতে পারেননি। সরলা ছিলেন দুর্গামোহন দাসের জ্যেষ্ঠ সন্তান। অল্প বয়সেই মাতৃহীনা হয়ে তিনি সহোদর ভাইবোনদের প্রতিপালনের দায়িত্ব নেন। ১৯১২-তে তিনি লন্ডনে Indian Women's Education Association প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২০-তে তিনি গোখলে মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৩-এ তিনি মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় মহিলা সম্মেলনের নির্বাচিত সভানেত্রী ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের তিনি সদস্যা ছিলেন। তিনি কিছুদিন ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের পরিচালনার দায়িত্বও নিয়েছিলেন। শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে তিনি অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করেছিলেন।

৫২ দুর্গামোহন দাস (১৮৪১-৯৭) ছিলেন প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম নেতা ও আইনজ্ঞ। কলকাতায় ও বরিশালে তিনি আইন ব্যবসা করেন। বিধবা বিবাহ প্রচলন করার জন্য তিনি বহু বালবিধবার পুনর্বিবাহ দেন। বিপত্নীক হওয়ার পরে নিজেও বিধবাবিবাহ করেন। ব্রাহ্মবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ করার জন্য কেশবচন্দ্র সেনের সহযোগী ছিলেন। পরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। ১৮৭৩-এ হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় ও ১৮৭৬-এ বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়-

এর তিনি একজন স্থপতি। বিভিন্ন হিতকর্মে তিনি অর্থসাহায্য করতেন। তিনি ভারত-সভার একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৮৭৬-এ তিনি পৌরসভার সদস্য হন। সরলা রায়, লেডী অবলা বসু, সত্যরঞ্জন দাশ, সতীশরঞ্জন দাশ ও বিচারপতি জ্যোতিষরঞ্জন এঁর কৃতী সন্তান।

৫৩ ১৯২০-তে গোখলে মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। নতুন শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন করার উদ্দেশ্য নিয়ে সরলা রায় তাঁর অত্যন্ত নিকটবন্ধু গোপালকৃষ্ণ গোখলের স্মারকরূপে গোখলে মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল ও পরে কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি স্কুলে যে শিক্ষাপদ্ধতি চালু করেন সেটা পরবর্তীকালে ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়। প্রাথমিকভাবে ৭নং বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের যে বাড়িতে ডাঃ পি কে রায় ও সরলা রায় থাকতেন তারই অধিকাংশ জায়গা তাঁরা ছেড়ে দিয়েছিলেন স্কুলের মেয়েদের হস্টেলের জন্য। পরে তাঁর জীবিতকালেই স্কুলের নিজস্ব ভবন তৈরি হয় হরিশ মুখার্জি রোডে। সরলা রায় নিজেই মেয়েদের রান্না ও পড়াশোনার দায়িত্বে ছিলেন। সতীশরঞ্জন দাশ স্কুলের মেয়েদের গাড়ির জন্য অর্থসাহায্য করেন। স্কুলটি খুবই নাম করে।

৫৪ কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩) ছিলেন সাহিত্যিক চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা। বেথুন স্কুল এবং কলেজে পড়ে বি এ পাশ করেন। বিদ্যালয়ে তিনি ছাত্রীদের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। ১৮৯৪-তে স্ট্যাটুটারি সিভিলিয়ান কেদারনাথ রায়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তার আগে পর্যন্ত তিনি প্রথমে বেথুন স্কুল ও পরে বেথুন কলেজে পড়াতেন। তিনি প্রধানত কবি হলেও বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গদ্যও রচনা করেছেন। *আলো ও ছায়া* তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। সম্প্রতি তাঁর লেখা গদ্যের একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে।

৫৫ অ্যানি বেসান্ট (১৮৪৭-১৯৩৩) লন্ডনের মধ্যবিত্ত আইরিশ পরিবারে জন্মেছিলেন। ১৮৬৭ সালে ক্যাথলিক ফ্র্যাঙ্ক বেসান্টকে বিয়ে করে অ্যানি উড-এর নাম হয় অ্যানি বেসান্ট। বিয়েতে ভাঙন ধরায় দুই সন্তানের অভিভাবকত্ব তাঁকে ত্যাগ করতে হয়। ইংল্যান্ডে থাকাকালীন সংস্কারপন্থী, সমাজবাদী, মার্কসবাদী বিভিন্ন পর্যায় পেরিয়ে তিনি ১৮৮৯-৯০ নাগাদ থিওসফিস্ট হয়ে ওঠেন। ১৮৯৩-এ তিনি ভারতবর্ষে এসে মাদ্রাজে থিওসফিকাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত হয়ে তিনি হোম রুল লিগ স্থাপন করেন। তিনি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর খুব ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন। তিনিই গান্ধীকে 'মহাত্মা' উপাধি দেন। ক্ষমতাশালী বক্তা হিসেবে ইওরোপে এবং ভারতবর্ষে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই হল *The Political Status of Women* (১৮৭৪), *Marriage, as it was, as it is, and as it should be : A Plea for Reform* (১৮৭৮), *Occult Chemistry. Study in Consciousness* (১৯০৭) ইত্যাদি।

৫৬ সরোজিনী নাইডু (১৮৭৯-১৯৪৯) : ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম মহিলা সভানেত্রী ও স্বাধীন ভারতের প্রথম মহিলা রাজ্যপাল। মাত্র বারো বছর বয়সে তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। দেশে ও বিলেতে পড়াশোনা সমাপ্ত করে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। গান্ধীজির খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। রাজনৈতিক প্রতিনিধি হয়ে বেশ কয়েকবার বিদেশে যান। ১৯৪৭-এ তিনি উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল হন। ১৯০৫-এ ওঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *The Golden Threshold* বেরোয়। ১৯২৬-এ তিনি মহম্মদ আলি জিন্নাহ্-র প্রথম জীবনী *The Ambassador of Hindu-Muslim Unity* লেখেন। ওঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বই হল *The Bird of Time* (১৯১২), *The Broken Wing* (১৯১৭), ইত্যাদি।

গ্রন্থতালিকা

১. ছেলেবেলার/দিনগুলি/পুণ্যলতা চক্রবর্তী/প্রণীত/সত্যজিৎ রায়/ও সুবোধ দাশগুপ্ত/অলঙ্কৃত/নিউস্ক্রিপ্ট প্রকাশিত।
পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৪২, পরিশিষ্ট। ২২.৫ সে.মি., ১৪.৫ সে.মি.।
আখ্যাপত্রের দুটি পৃষ্ঠা পরে প্রকাশনা-সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য এইভাবে দেওয়া আছে :
প্রথম সংস্করণ। আশ্বিন, ১৩৬৫
দ্বিতীয় সংস্করণ। ফাল্গুন, ১৩৮১
প্রকাশক : সুচরিতা দাশ
নিউস্ক্রিপ্ট। ১৭২/৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা ২৯
পরিচ্ছেদগুলির শীর্ষালঙ্করণ ও ১১-পৃষ্ঠার ছবিটি ছাড়া অন্যান্য ছবি : সত্যজিৎ রায়
পরিচ্ছেদগুলির শীর্ষালঙ্করণ ও ১১-পৃষ্ঠার ছবি : সুবোধ দাশগুপ্ত
মুদ্রণে : শ্রীমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ২৫/১এ কালিদাস সিংহী লেন, কলকাতা ৯
ব্লক : রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট। ৭/১ বিধান সরণী, কলকাতা ৬
মূল্য : পাঁচ টাকা
উৎসর্গ : রনুসোনা তোতোমনি জোজোমনি বাবুসোনা।
মোট ২০টি পরিচ্ছেদে বইটি সমাপ্ত।

* **আনন্দ সংস্করণ**

১ক. ছেলেবেলার দিনগুলি/পুণ্যলতা চক্রবর্তী/সত্যজিৎ রায় ও সুবোধ দাশগুপ্ত অলঙ্কৃত/প্রচ্ছদ : সত্যজিৎ রায়/আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড/কলকাতা ৯।
আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায় আছে :
প্রথম আনন্দ সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৭
ISBN 81-7215-584-0
মূল্য : ৪০.০০
পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৪১, ১৮.৫ সে. মি., ১২ সে. মি.।
এই সংস্করণের প্রচ্ছদ, অলঙ্করণ, নিবেদন, উৎসর্গ, পাঠ্যাংশ ও পরিশিষ্ট নিউস্ক্রিপ্ট সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ মাত্র।

২. পুণ্যলতা চক্রবর্তী/ছোট্ট ছোট্ট গল্প/ছবি : সত্যজিৎ রায়/আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড/কলকাতা ৯।
আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায় আছে :
প্রথম আনন্দ সংস্করণ বইমেলা ১৯৮৬ থেকে চতুর্থ মুদ্রণ আগস্ট ১৯৯৪ পর্যন্ত
মুদ্রণ সংখ্যা ২৮৯৫০
পঞ্চম মুদ্রণ জুন ১৯৯৯ মুদ্রণ সংখ্যা ৫০০০
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ সত্যজিৎ রায়
ISBN 81-7066-776-3
মূল্য ৪০.০০

পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৭৯, ২৪ সে. মি., ১৮ সে. মি.।

সূচি : আদুরে খুকু, সখী আর দুঃখী, সাদির ম্যাজিক, ভীতু নিতু, আমচোর, লালির ছানা, সেই লোকটা, ব্যাঙের নৌকো, হনু, উমরী-ঝুমরী, বেলুন, খোকা আর পোকা, কোকো, পিংকা আর, বুনো আর পোষা, মা-হারা, কাল বৈশাখী, হ্যাংলা, আষাঢ়ে, টাইনি, আকাশ পিদীম, লম্বু, ভুলোর ভুল, ইঁদুর ছানা, দুই ভাই, খবরদার, লালু আর নীলু, ভালু, হিংসুটি, 'সে কোন বনের হরিণ', ছুট্‌কী, ভুটু, বাদল দিনে, হাসু, জব্দ নদী, "হিজিবিজি কাগের ছানা", পুতুলের নাম টুটুল, বাঁদর মা, রাজা ও রানী, দিদি, রাত দুপুরে, কাকুর কুমীর, সাত বৌ, "পিঠা পরব", বেবী কোথায়?, গুব্‌রে আর পিঁপড়ে, স্যান্টা ক্লস, ছোট্ট দাদা ছোট্ট বোনটি।

উৎসর্গ : ইন্দ্রনীল ও তিমা-কে।